দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৭ বর্ষ, ৭ সংখ্যা।।
২৯ সেপ্টেম্বর - ২০১৪।।
১২ আশ্বিন - ১৪২১।।
website : www.eswastika.com

অমল কুমার বসু স্মরণে

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত।।

৬৭ বর্ষ ৭ সংখ্যা, ১২ আশ্বিন, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

২৯ সেপ্টেম্বর - ২০১৪, যুগাব্দ - ৫১১৬,

Website : www.eswastika.com

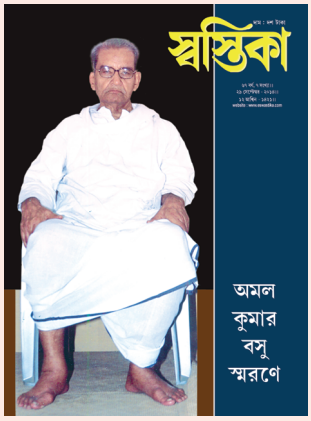

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-১০

খোলা চিঠি : শরতের আকাশে সারদার মেঘ

দিদির কপালে পদ্মকাঁটার ভাঁজ ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

সিলেবাসে ইতিহাসের বিকৃতি— জাতি ও দেশের পক্ষে জঘন্যতম অপরাধ ▯ ড: প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় ▯ ১২

পারিবারিক-পরম্পরার পুজো ▯ সংকর্ষণ মাইতি ▯ ১৪

বাঁকুড়ার পটচিত্রে দুর্গাপুজো ▯ মেঘদূত ভুঁই ▯ ১৭

হাওড়ার রামরাজাতলার দেবী কাত্যায়নী ▯ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল ▯ ২১

মুন্সীরহাটের বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজো ▯ শুভাশিস রায় ▯ ২২

একাত্ম মানবদর্শন ও ভারতের আর্থিক বিকাশ ▯ সুতপা ভড় ▯ ২৭

'আচ্ছে দিন' এসে গেছে, বিরোধিরা চোখে পট্টি বেঁধেছে ▯ দেবব্রত চৌধুরী ▯ ২৯

ইউনিফর্মের ইউনিফর্মিটি ▯ দেবাংশু ঘোড়ই ▯ ৩১

স্বয়ংসেবক অমলদা ▯ কেশব দীক্ষিত ▯ ৩৫

স্বর্গীয় অমলকুমার বসু ▯ রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩৬

'মৃত্যুর মন্থর পথে যে পান্থ চলিয়াছে অমৃতলোকের পানে' ▯ তুষারকান্তি ঘোষ ▯ ৩৭

'আপনি কিছু জানেন না' ▯ বিজয় আঢ্য ▯ ৪১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **অন্যরকম : ৩৩**

প্রকাশিত হবে
২০ অক্টোবর
২০১৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২০ অক্টোবর
২০১৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

দীপাবলী সংখ্যা

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে
দাম ৭০.০০ টাকা

HB

INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

HB AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

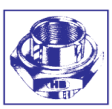

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833

3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষক দিবসকে 'গুরু দিবস' হিসাবে ঘোষণা করিবার ফলে কেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং এই রাজ্যের কিছু শিক্ষক গেল গেল রব তুলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাহা আজ বোধগম্য হইতেছে। আমাদের পাশের রাজ্য ওড়িশায় শিক্ষক দিবসকে গুরুদিবস হিসাবে পালন করা হইয়া থাকে বহুকাল। গোটা উত্তর ভারত, মধ্যভারত এবং পশ্চিমভারতে শিক্ষককে ছাত্ররা গুরুজী বলিয়াই সম্বোধন করিয়া থাকে। প্রাচীন ভারতে গুরুই ছিলেন শিক্ষাদাতার পাশাপাশি সামাজিক ঔচিত্যবোধ, আধ্যাত্মিক ঔচিত্যবোধ সহ ঐহিক ও পারমার্থিক জীবনের পথপ্রদর্শক। ক্রমে রাজনৈতিক কৌশলে গুরু হইয়া উঠিলেন-বিদ্যা-বিক্রয়কারী শিক্ষক। ফলে আর পাঁচটি পেশার মতো শিক্ষকতাও হইয়া উঠিল একটি চাকুরি মাত্র। দায় নাই, দায়িত্বও নাই। যদিও দেশের স্বার্থেই প্রতিটি শিক্ষকের গুরু হইয়া উঠিবার আশু প্রয়োজন। কারণ শিক্ষকরাই সমাজের মেরুদণ্ড। তাঁহাদের গুরু হইয়া উঠিবার মধ্যেই ছাত্র তথা দেশের সার্বিক ও বিকাশ সম্ভব। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ শিক্ষকের যে গুরু হইবার যোগ্যতা নাই সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তীকে দেখিয়া তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্যই বিদ্যামন্দির। যেখানে আচার্য ও ছাত্ররা মনন ও মানসের উৎকর্ষ সাধনে, বিদ্যার চর্চা ও নব নব গবেষণায় বিদ্যার সৃষ্টি করিবে। কিন্তু বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার প্রাঙ্গণে যাহা চলিতেছে তাহা অভিপ্রেত নহে। দলদাসত্বের কুফলই ইহার কারণ। শিক্ষকরা নিজেরাই যদি দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রকাশ করিয়া পুত্রবৎ ছাত্রছাত্রীদের অত্যাচার করিয়া থাকেন তবে ছাত্ররাই সেই পথ অনুসরণ করিবেন না কেন? ইহার ফলে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে বিষবৎ। সম্মান পাইতে হইলে নিজের সম্মানীয় চরিত্রটি সর্বাগ্রে গড়িয়া তুলিতে হয়। আজ যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে হাজার হাজার কণ্ঠ ধিক্কার জানাইতেছে, তাঁহার পদত্যাগ দাবি করিতেছে, একজন শিক্ষক হিসাবে ইহাই তাঁহার অপমান, ব্যর্থতা, অযোগ্যতা ও অপদার্থতা। তাঁহার বিরুদ্ধে কন্যাসম ছাত্রীরা শ্লীলতাহানির অভিযোগ জানাইবার পরও তিনি হামবড়াই করিতেছেন। আমরা জানি, মানী ব্যক্তির অপমান মৃত্যুতুল্য। কিন্তু নির্লজ্জতাও যে কোনো শিক্ষকের ভূষণ হইতে পারে এই উপাচার্যকে দেখিয়া তাহা বোধ হইতেছে। যোগ্যতা নয়, দলদাসত্বের সৌজন্যে উপাচার্য হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নির্লজ্জ পক্ষপাতটি প্রকাশ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। আসলে বঙ্গেশ্বরীর মন্দিরে অর্ঘ্য চড়াইবার কোনো সুযোগই তিনি হাতছাড়া করিতে নারাজ। অনুমান, যাদবপুরের উপাচার্য সেই তাগিদেই চালিত হইতেছেন। রাজনৈতিক প্রভুর প্রতি আনুগত্য যখন এতটাই প্রবল তখন সরাসরি দলে যোগ দেওয়াই বিধেয়। উপাচার্য পদটির যেটুকু সম্মান এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহাকে আর কালীঘাটের ধূলায় মিশাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই। উপাচার্য বলিয়াছেন, খুন হইবার ভয়েই তিনি পুলিশ ডাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যদিও তাহার পরের ইতিহাস কলঙ্কিত।

বস্তুত, পুলিশ সেদিন তাঁহাকে বাঁচাইলেও ছাত্রদের কাছে আজ তিনি মৃত, প্রেতবৎ। সমাজের চোখেও আজ তিনি অবাঞ্ছিত আবর্জনা মাত্র। এহেন মানুষ শিক্ষার প্রাঙ্গণে অবস্থান করিলে শিক্ষা শব্দটিও কলঙ্কিত হয়। ছাত্রসমাজ তাঁহাকে বর্জন করিলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এমন রত্নকে পরিত্যাগ করে নাই। বস্তুত, এমন রত্নই শিক্ষাক্ষেত্রকে কলুষিত করিতেছে।

সুভাষিত

দানেন পাণির্ন তু কাঞ্চনেন স্নানেন শুদ্ধির্ন তু চন্দনেন।
মানেন তৃপ্তির্ন তু ভোজনেন জ্ঞানেন মুক্তির্ন তু মুণ্ডনেন।। —চাণক্যনীতি

দানের দ্বারা হস্ত অলঙ্কৃত হয়, স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা নয়। স্নানের দ্বারা শুদ্ধতা আসে, চন্দনের দ্বারা নয়। সম্মান দ্বারা তৃপ্তি লাভ হয়, ভোজনের দ্বারা নয়। জ্ঞানই মুক্তির পথ, মস্তক মুণ্ডনে নয়।

সারদা-জমায়েতের জোড়া ফাঁসেই কি তৃণমূলের মৃত্যু ঘটবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত স্বস্তিকার প্রচ্ছদ নিবন্ধের শিরোনাম ছিল 'জামায়াত-বিএনপি'র পাশে মমতা?' সেই নিবন্ধের এক জায়গায় বলা হয়েছে— 'বিএনপি মমতার সঙ্গে একটি যোগসূত্র গড়ে তুলেছে। পশ্চিমবঙ্গে জামায়েত ইসলামি মমতার সহায়তায় শেখ হাসিনা বিরোধী একটি বড় গোষ্ঠী তৈরি করেছে। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলাদেশের জামায়াত ইসলামি ও বিএনপি যোগাযোগ রক্ষা করছে'। সারদা নিয়ে সিবিআই তদন্ত শুরু হতেই গত ফেব্রুয়ারি মাসে স্বস্তিকায় প্রকাশিত আশঙ্কাই সত্য প্রমাণ হতে চলেছে। ঝুলি থেকে বিড়াল নয়, এমন সব টাইগার বেরোতে শুরু করেছে যাদের এক একটি মমতার তৃণমূল-কে গিলে খাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

সাক্ষ্য প্রমাণ লোপাট হওয়ার জন্য সারদা কাণ্ডে সিবিআই শেষ পর্যন্ত কতজনকে গরাদে পুরতে পারবে সেটা এখনি বলা না গেলেও এই তদন্তে এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে, ক্ষমতার জন্য মমতা করতে পারেন না এহেন কাজ নেই। বিভিন্ন রিপোর্টে উঠে আসা তথ্য যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয় তাহলে বলতে হবে যে ২০১১-এর নির্বাচনে ৩৪ বছরের বাম শাসনের অন্ধকার ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায়, একটু আলোর সন্ধানে আমজনতা খড়কুটোর মতো যে মমতাকে আঁকড়ে এ রাজ্যে পরিবর্তনের আলো জ্বেলেছিল, সারদা চিটফান্ডের মাধ্যমে সেই আমজনতার লুঠ হয়ে যাওয়া অর্থে হেলিকপ্টার চড়তে, নির্বাচনের বিপুল খরচ মিটাতে, বাংলাদেশের ভারত বিরোধী কট্টর মৌলবাদী শক্তি যাদের মূল উদ্দেশ্য দেশে দেশে তালিবানি শাসন কায়েম করা সেই জামায়েতকে অর্থ সাহায্য করতে মমতার এতটুকুও বাধেনি। রিপোর্ট বলছে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের উর্দুভাষী কিছু নেতার যোগাযোগ শুরু হয় বাংলাদেশের জামাতে ইসলামির সঙ্গে। ২০১১-র ভোটেও সীমান্ত এলাকায় জামাতের কট্টরপন্থীরা তৃণমূলের হয়ে কাজ করে। সে সময়ে জামাতে ইসলামি তৃণমূলকে অর্থেরও জোগান দিয়েছিল। তার বিনিময়ে তৃণমূলের উর্দুভাষী নেতারা বাংলাদেশে হাসিনা প্রশাসনের তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসা জামায়েত দুষ্কৃতীদের কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় দিনের পর দিন আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে এই বিষয়টি ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে। সেই সব আশ্রয় শিবিরে থাকা অনুপ্রবেশকারী জামায়েত কর্মীরা গত পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের হয়ে কাজ করেছে এমন অভিযোগও উঠেছে। এই রাজনৈতিক সমঝোতার প্রতিদানে বাংলাদেশে জামায়েতের ধ্বংসাত্মক কাজে, হিন্দু নিধন ও বিতাড়নের কাজে তৃণমূল যথাসাধ্য সাহায্য করেছে বলে অভিযোগ।

গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছে তৃণমূল জামায়েতের এই দেওয়া- নেওয়া শর্ত ও সুসম্পর্ক থেকেই পরবর্তীকালে জামায়েতকে তৃণমূল শুধু পাল্টা সাহায্যই করেনি, তিস্তা চুক্তি ও স্থল সীমান্ত চুক্তি আটকে দিয়ে বাংলাদেশে হাসিনা সরকারকেও বিপদে ফেলার চেষ্টা করে। গোয়েন্দা রিপোর্টের আরো দাবি, বাংলাদেশ সংক্রান্ত নীতির বিষয়ে মমতা বরাবর জামাতের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ রাখা উর্দুভাষী নেতাদের মতামতই মেনে চলেছেন। বাংলাদেশের গোয়েন্দা রিপোর্টে এমন দাবিও করা হয়েছে যে, ইমরানের (তৃণমূল কংগ্রেসের

স্বস্তিকা ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সংখ্যার প্রচ্ছদ।

রাজ্যসভার সাংসদ) মাধ্যমে অর্থের পাশাপাশি আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরকের বেশ কয়েকটি চালানও ভারত থেকে পৌঁছে গিয়েছিল জামাতের হাতে।'

গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে, সারদার বেশ কিছু অ্যাম্বুলেন্সে কাঁচা টাকার বান্ডিল নিয়ে যাওয়া হোত বনগাঁ, বালুরঘাট, বসিরহাট, নদীয়া, মালদহ ও কোচবিহারের সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে। তার পরে তা বাংলাদেশি টাকা, ডলার বা ইউরোয় পরিবর্তন করে জামাতের এজেন্টদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া, হাওলা ও হুন্ডির মাধ্যমেও গিয়েছে সারদার টাকা। বাংলাদেশের গোয়েন্দা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, জামাত পরিচালিত বেশ কিছু হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বেনামে লগ্নিও করেছে সারদা। সেই অর্থও কার্যত জামাতের 'জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন'-এ খরচ হয়েছে।

না, নেত্রী না জেনে না বুঝে এমনটা করে ফেলেছেন এটা বলা যাবে না। কারণ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সারদা কাণ্ডে সিবিআই তদন্ত শুরু হওয়ার আগে এই তদন্ত আটকানোর জন্য 'সততার প্রতীক' মমতা সরকারি কোষাগার থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ করেছেন; সিট গঠন করে তথ্য প্রমাণ লোপাটের যাবতীয় প্রয়াস করেছেন, শ্যামল সেন কমিটি গঠন করে ক্ষতিপুরণের নামে ৫০০ কোটি টাকার ফান্ড গঠন করে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

শুধু কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাই নয়, রাজ্য সরকারের নিজস্ব গোয়েন্দা রিপোর্টও অভিযোগের আঙুল তুলেছিল আহমেদ হাসান ইমরানের বিরুদ্ধে। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোয়েন্দা পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারের মাধ্যমে ক্যানিং থানার নলিয়াখালিতে হিন্দুদের উপর আক্রমণের ঘটনায় ইমরানের যুক্ত থাকার কথা জানিয়েছিল স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে। ওই রিপোর্টে তদন্তকারী অফিসারের বক্তব্য ছিল, পার্কসার্কাসের বাসিন্দা, সিমি-র প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ইমরান পার্ক সার্কাস থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলমান যুবককে বোমা এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র-সহ নলিয়াখালিতে পাঠানোর ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই যুবকরা সেখানে বহু ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, লুঠপাট চালায়। সেদিন প্রায় ৩০০ বাড়ি ভাঙচুর করে ও আগুন লাগিয়ে লুঠপাট করা হয়েছিল। শুধু পার্কসার্কাস নয়, কলকাতার রাজাবাজার, মেটিয়াবুরুজ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট-বাসন্তী এলাকা থেকেও বহু সশস্ত্র যুবককে সেদিন নলিয়াখালিতে পাঠিয়েছিলেন ইমরান। তার পরেও চলতি বছরের গোড়ায় ইমরানকে রাজ্যসভার মনোনয়ন দেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাভাবিকভাবেই এখন প্রশ্ন উঠবে, অগ্নিকন্যার মুসলমান বেশ, নমাজ পড়া, ইমাম ভাতার ঘোষণা, নরেন্দ্র মোদীকে কোমরে দড়ি বেঁধে জেলে ঢোকানোর আওয়াজ কি জামায়েতের ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের খুশি করার জন্যই?

কলকাতায় ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের বিশাল সমাবেশ

সংবাদদাতা॥ গত ১৯ সেপ্টেম্বর দুপুরে কলকাতার রানী রাসমণি এভিনিউয়ে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের পশ্চিমবাংলা শাখার উদ্যোগে এক সমাবেশ হয়। রাজ্যের প্রায় সব জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে কয়েক হাজার কৃষক ফসলের লাভকারী মূল্য, ফসলের বীমার সুযোগ ও তার লাভ পাওয়া, কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণ পাওয়া ইত্যাদির দাবিতে ধরনা প্রদর্শন করেন।

কলকাতায় কৃষক সমাবেশের একাংশ।

কিষাণ সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি অজিত কুমার বারিক গ্রামবাংলার কৃষকদের দুর্দশার বিস্তারিত ভাবে বক্তব্য রাখেন। সর্বভারতীয় সম্পাদক মোহিনীমোহন মিশ্র কৃষকদের দুর্দশা মোচনে সর্বৈব ব্যর্থ হওয়ার জন্য সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে ধিক্কার জানান। কৃষকদের সমস্যার সমাধানের জন্য সমস্ত কৃষককে একজোট ও সংগঠিত হয়ে সংগ্রামের জন্য আহ্বান জানান সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক দীনেশ কুলকার্ণি। এছাড়াও সারদা তথা চিটফান্ডের মাধ্যমে সাধারণ কৃষকদের প্রতারণার জন্য ওই সভায় ক্ষোভ ব্যক্ত করা হয়।

ধানের দাম ক্যুইন্টাল প্রতি ২২০০ টাকা, আলুর দাম ১৫০০ টাকা এবং পাটের দাম ৪০০০ টাকা পাওয়ার দাবি জানানো হয়।

সভা শেষে প্রদেশ ও সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে স্মারক লিপি দেন। রাজ্যপাল লাভকারী ফসলের মূল্য, বি.টি. বেগুনের মাধ্যমে মানুষ তথা অন্য প্রাণীকুল কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ও এই মারাত্মক বীজ (বি.টি. বেগুনের) কীভাবে রদ করা যায়, কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সমস্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন এবং সহানুভূতির সঙ্গে তার প্রতিকারের আশ্বাস দেন।

বসিরহাট দক্ষিণে জয়ী বিজেপি-র শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ উত্তর ২৪-পরগনার বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী শমীক ভট্টাচার্যের দেড় হাজার ভোটে জয় এবং সেইসঙ্গে চৌরঙ্গি বিধানসভা কেন্দ্রেও বাম-কংগ্রেসকে পেছনে ফেলে দু'নম্বর স্থানে বিজেপি-র উঠে আসা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। একক ভাবে লড়ে এই প্রথমবার রাজ্য বিধানসভায় প্রতিনিধি পাঠাল বিজেপি।

এর আগে ১৯৯৯ সালে এই জেলারই অশোকনগর কেন্দ্র থেকে উপনির্বাচনে তৃণমূলের জোটসঙ্গী হয়ে জিতেছিলেন বিজেপি প্রার্থী বাদল ভট্টাচার্য। বসিরহাট দক্ষিণ কেন্দ্রে শমীক ভট্টাচার্য ভোট পেয়েছেন ৭১০০২; শতাংশের হিসাবে ৩৭.১৮ শতাংশ (লোকসভা ভোটে যা ছিল ৩৮.০৮ শতাংশ) আর চৌরঙ্গি কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী রীতেশ তিওয়ারি ভোট পেয়েছেন ২৩,৯৮৪, ২৪.৮১ শতাংশ (লোকসভায় ২৫.৬৯ শতাংশ)। শমীকবাবু তৃণমূলের প্রার্থী ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাসকে ১৫৮৫ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন।

জয়লাভের পর দলীয় সমর্থকদের সঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য।

বাঁদিক থেকে জয়ীরা মোহিত নাগর, পরওয়েশ মালিক, কণিকা শেখাওয়াত ও আশুতোষ মাথুর।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'চার'-টি আসনেই এ বি ভি পি-র জয়

সংবাদদাতা॥ ১৮ বছর পর গত ১২ সেপ্টেম্বর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে 'চার'টি আসনেই জয়লাভ করে নজির স্থাপন করল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। উল্লেখ্য, এবার কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এন এস ইউ আই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে খাতাই খুলতে পারেনি। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রার্থীরা সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক চারটি আসনেই বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে ছাত্রসংসদ দখল করেছেন। সভাপতি পদে মোহিত নাগর, সহ-সভাপতি পরওয়েশ মালিক, সাধারণ সম্পাদিকা কণিকা শেখাওয়াত এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ মাথুর নির্বাচিত হয়েছেন।

মঞ্চে বাঁ দিক থেকে অতুলকুমার বিশ্বাস, ললিত বসু, মোহন ভাগবত ও রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাষ্ট্রহিতে সমর্থ হওয়াই অমলদার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পথ : শ্রীভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আমাদের দর্শন অনুযায়ী অন্য নাম-রূপ নিয়ে ফিরে এসে অমলদা আবার আমাদের রাষ্ট্রহিতে প্রেরণা দেবেন— এই ভাবনা সত্ত্বেও রাষ্ট্রকে পরমবৈভবশালী করার ব্রতে তাঁর মতো সমর্থ হওয়াই তাঁকে শ্রদ্ধা জানোনোর শ্রেষ্ঠ উপায়। গত ১৪ সেপ্টেম্বর বিকেলে কলকাতায় কেশব ভবনে প্রয়াত অমলকুমার বসুর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে একথা বলেন সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। গত ১০ সেপ্টেম্বর সকালে কলকাতার বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী হাসপাতালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক অমলকুমার বসু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শ্রীভাগবত অনুশাসন নিয়ে প্রয়াত অমলদা তাঁকে স্বামীজীর জীবনের যে ঘটনাটির কথা বলেছিলেন তার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেন, বরানগর মঠে সন্ন্যাস আশ্রমে ব্রতী গুরুভাইদের সঠিক পথে পরিচালনার জন্য যে অনুশাসন পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, অনেকবার বলা সত্ত্বেও একজন গুরুভাই কিছুতেই তা পালন করছিলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁকে শাস্তি স্বরূপ বলা হলো যে সে ভিক্ষে করে যা পাবে তা দিয়েই তাকে সেদিনের আহার সারতে হবে। গুরুভাই সারাদিন ভিক্ষে করে ক্লান্ত দেহে যখন ফিরলেন, তখন দেখলেন স্বামীজী না খেয়ে বসে আছেন। তিনি যখন এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, স্বামীজী তখন বলেছিলেন, তুই না খেলে আমি খাবো কি করে। চল, এখন দুটি ভাত ফুটিয়ে খাই। সঙ্ঘের অনুশাসনের পেছনেও এই ভাবই কাজ করছে।

প্রয়াত অমলদার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে স্মরণসভার সূচনা হয়। অমলদার স্মৃতিচারণা করেন সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ অসীম কুমার মিত্র, কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির পশ্চিমবঙ্গ শাখার কার্যবাহিকা ঋতা চক্রবর্তী, বিদ্যাভারতীর তত্ত্বাবধায়ক সত্যব্রত সিংহ, সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক রঞ্জন কান্তি ভুঁইয়া, অমলদার ছোট ভাই ললিত বসু প্রমুখ।

অমলদার শরীরে কাটা দাগের উল্লেখ করে ললিতবাবু বলেন, সেজদা (অমলদা) যে কেমন সাহসী ছিলেন এই দাগ তার প্রমাণ। জব্বলপুরে সাইকেলে চেপে যাওয়ার সময় কয়েকজন গুণ্ডা আক্রমণ করলে তিনি দণ্ড (লাঠি) দিয়ে তাদের প্রতিহত করার সময় এই আঘাত লাগে। সভায় সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ ভাগাইয়াজী ও একদা বাংলায় কর্মরত বিজয়গণেশ কুলকর্ণীর পাঠানো শোকবার্তা পাঠ করা হয়। সভার শেষে অমলদার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে সকলে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা উন্মোচন ও ভবেন্দু ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে

পাঠকের কাছে সত্য উপস্থাপনই সংবাদপত্রের কাজ : রঞ্জিৎ রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ''একই খবর বিভিন্ন কাগজে বিভিন্ন ভাবে পরিবেশিত হতে দেখা যাচ্ছে। এতে পাঠক খবরের সত্যতা যাচাই করতে পারেন না, তাঁরা দিগ্‌ভ্রান্ত হন। সংবাদপত্রের কাজ যা সত্য তাই পাঠকের কাছে উপস্থাপন করতে হবে।'' গত ২০ সেপ্টেম্বর স্বস্তিকা পত্রিকার পূজা সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠানে কলকাতার 'ভারত সভা' হলে কথাগুলি বলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক কলকাতা প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক রঞ্জিৎ রায়। এদিন একই সঙ্গে ভবেন্দু ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতারও আয়োজন করা হয়। 'সত্যের সন্ধানই সাংবাদিকতা' বিষয়ে বক্তব্যে শ্রীরায় সত্য সংবাদ পরিবেশনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। সমাজের সর্বস্তরে সাংবাদিকদের 'আড্ডা' দিয়ে সত্য সংবাদ সংগ্রহ করতে হয় তাও বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন তিনি। ভবেন্দু ভট্টাচার্য কীভাবে হাতে ধরে প্রকৃত সাংবাদিক তৈরি করতেন বারবার তার উল্লেখও করেন। তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি— ভবেন্দু ভট্টাচার্যই তাঁকে তৈরি করেছেন।

সভানেত্রী এষা দে ও রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখছেন রঞ্জিৎ রায়।

স্বস্তিকার সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য ভবেন্দু ভট্টাচার্য সম্পর্কে বলেন— ''ঋজু ব্যক্তিত্বের অধিকারী ভবেন্দু ভট্টাচার্য সাহিত্য ও সাংবাদিকতার সঙ্গে জীবনের ছ'টি দশক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছিলেন। তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতাকে সাধনা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।'' শ্রী আঢ্য জানান— তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্যই স্বস্তিকার পক্ষ থেকে প্রথম স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতি বছর এই স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হবে। এভাবেই আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে উদ্যোগী। অনুষ্ঠানে সভানেত্রী রূপে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত লেখিকা শ্রীমতি এষা দে। স্বস্তিকা পত্রিকায় 'পূজা সংখ্যা' উল্লেখ থাকায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন— আজকাল 'পূজা সংখ্যা' কথাটি আর কেউ ব্যবহারই করছে না। এক্ষেত্রে 'স্বস্তিকা' নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী। তিনি উল্লেখ করেন— তাঁর বাবা স্বর্গীয় বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে মনেই রাখেনি তিনি যেসব পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু স্বস্তিকা পত্রিকা ভবেন্দু ভট্টাচার্যকে ভুলে যায়নি এ বড় আনন্দের কথা। এদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করেও স্বস্তিকার লেখক ও পাঠকরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্বস্তিকার সহ-সম্পাদক নবকুমার ভট্টাচার্য। সকলকে ধন্যবাদ জানান স্বস্তিকা-র আর এক সহ-সম্পাদক সুকেশ মণ্ডল।

পরলোকে মুক্তিশঙ্কর সিংহ

গত ২০ সেপ্টেম্বর বিকালে কলকাতার বাগবাজার শাখার স্বয়ংসেবক মুক্তিশঙ্কর সিংহ উত্তর কলকাতার সি আই টি বিল্ডিং-এর বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও পুত্রবধূ, ১ কন্যা ও নাতি নাতনি এবং বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন। প্রথম জীবনে তিনি সঙ্ঘকাজ বিস্তারের জন্য বিস্তারক হিসাবে সময় দিয়েছিলেন। শেষ জীবনে কয়েক বছর কল্যাণ আশ্রমের বনবাসী ছাত্রদের অভিভাবক রূপে পুরুলিয়া জেলায় বলরামপুর ছাত্রাবাসে থেকেছেন।

বিজ্ঞপ্তি

পূজাবকাশের জন্য ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর, ২০১৪ পর্যন্ত স্বস্তিকা দপ্তর বন্ধ থাকবে। ৮ অক্টোবর, ২০১৪ স্বস্তিকা দপ্তর খুলবে। ৬ এবং ১৩ অক্টোবর, ২০১৪, স্বস্তিকার কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। —সম্পাদক

শরতের আকাশে সারদার মেঘ দিদির কপালে পদ্মকাঁটার ভাঁজ

প্রিয় পাঠক,

প্রাক পূজা অভিনন্দন। এই চিঠি যখন আপনাদের উদ্দেশে লিখছি তখন উমার আগমন বার্তা আকাশে বাতাসে। মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে শেষ বেলার প্রস্তুতি। অকাল বোধনকে উপলক্ষ্য করে মহাউৎসবের আয়োজন। কিন্তু তার আগেই যে এরাজ্যে রাজনৈতিক অকাল বোধন হয়ে গেল। উপনির্বাচন যে এক অকাল ভোট। আর তাতে বোধন হলো পদ্মের।

বসিরহাট দক্ষিণ একটি পদ্ম উপহার দিয়েছে বঙ্গজননীকে। কিন্তু আরও আরও শতদলে যে বাংলা-মা সেজে উঠবেন, পুজো নেবেন তার ঢাকে যেন কাঠি পড়ে গেল।

বসিরহাট দক্ষিণ এবং চৌরঙ্গি বিধানসভার উপনির্বাচনের ফল প্রকাশের পর তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থকরা সবুজ আবির অনেক ওড়ালেন কিন্তু তাতেও দলীয় সঙ্কট ঢাকা পড়ল না। বরং তৃণমূল কংগ্রেসের ভাগ্যাকাশে যে কালো মেঘের ঘনঘটা তা আরও স্পষ্ট হয়ে গেল। কলকাতার দুর্গাপুজোর অনেক ভাগ। তারই একটা ভাগ হলো অর্থ প্রদর্শনের পুজো। আর তার হোতারা সকলেই তৃণমূল কংগ্রেস নেতা। কোনো কোনো মন্ত্রীর আবার একসঙ্গে অনেকগুলো পুজো কমিটি। সেখানে এতদিন পর্যন্ত সারদা অর্থের জমক দেখা গেছে। এখন সেই অর্থ নেই, কিন্তু অন্য সূত্রে অর্থাগমের অভাব নেই। সেই অর্থে অনেক আয়োজন, তবু আনন্দ নেই। সিবিআই, ইডি এসব তো আছেই, সেই পদ্মকাঁটাও বিঁধছে।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চূড়ান্ত অবনতি, পরিবহণ ক্ষেত্রকে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না, শাসক দলের বিরুদ্ধে বিশাল পরিমাণ আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের ওপর আক্রমণের অপবাদ এসব তো আছেই কিন্তু তার থেকে কালীঘাটের কাছে বড় দুশ্চিন্তা পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি'র উত্থান। এতদিন 'দু'টি লোকসভা আসন ও আর এমনকী, সবই তো মোদী হাওয়ায়' বলে লোক ঠকানো যাচ্ছিল কিন্তু এবার যে বিজেপি একক শক্তিতে বিধানসভাতেও প্রবেশ করল! সাধারণত উপনির্বাচনে শাসকের পক্ষেই রায় যায়। সেই সঙ্গে অল্প দু'একটি আসনে নির্বাচন হওয়ায় সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপাতে পারে সংগঠন। সে সবই হয়েছে বসিরহাট দক্ষিণ কিংবা চৌরঙ্গিতে। তবু ঝড় ঠেকানো গেল না। আর সেই ভোটের প্রাপ্ত হিসেব বলছে, আসন্ন কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে বিজেপি'কে রোখা মুশকিল। আর বসিরহাট ও টাকি পুরসভার দখল নিশ্চিত ভাবেই বিজেপি'র হাতে যেতে বসেছে।

এই দুই কেন্দ্রের ফল আরও একটা বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছে। বিজেপি-ই এখন শাসক দলের প্রধান প্রতিপক্ষ। চৌরঙ্গি কেন্দ্রে জয় না পেলেও তারাই দ্বিতীয় সর্বাধিক ভোট প্রাপক। সুতরাং ২০১৬ সালে পরিবর্তনের পরিবর্তন আনার যে ডাক বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ দিয়েছেন তা এখন রীতিমতো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যান্ড কোং-এর কাছে।

কদিন আগেও যে দলটাকে শক্তিহীন বলে অবজ্ঞা করা যেত সেই এখন চ্যালেঞ্জারের ভূমিকায়। অন্যদিকে রাজ্যের চতুর্মুখী লড়াইয়ের অপর দুই শক্তি যে ক্রমশই ম্রিয়মান তাও স্পষ্ট করল উপনির্বাচন। খোদ কলকাতার চৌরঙ্গি কেন্দ্রে জমানত জব্দ হয়েছে বাম প্রার্থীর। আর বসিরহাট দক্ষিণের অবস্থা আরও ভয়ানক। যেখানে আগের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্য জুড়ে বামেদের ভরাডুবির মধ্যেও লাল ঝাণ্ডা তুলে রেখেছিল সিপিএম, সেখানে কোনো রকমে তৃতীয় স্থানটা জুটেছে। আর কংগ্রেস গত লোকসভা নির্বাচনেও চৌরঙ্গিতে ছিল প্রথম স্থানে আর উপনির্বাচনে তৃতীয় স্থানে। বসিরহাট দক্ষিণে তো জমানতই জব্দ হয়েছে।

এহেন পরিস্থিতিতে হে পাঠক আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ দিদির প্রতি করুণা দেখান। দয়া করে কথায় কথায় ওঁর খুঁত ধরবেন না। দিদি দল সামলাবেন না সিবিআই সামলাবেন বুঝতে পারছেন না। দিদির মতো একজন মহৎ শিল্পী যাঁর ছবি কোটি কোটি টাকায় বিকোয় তিনি ছবি আঁকায় মনোনিবেশ করতে পারছেন না। সারদা নেই। ১৬ সালের ভোটে টাকা আসবে কোথা থেকে? ছবি না বেচলে চলবে কী করে? এরমধ্যে আবার দলের সঙ্গে জঙ্গি যোগাযোগের অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। বেশ জোরদার অভিযোগ। সুতরাং দোহাই পাঠক! একটু মেনে নিন। দিদির মাথা গরম আছে। মোদীবাবুকে কোমরে দড়ি পরাবেন বলেছিলেন। কিন্তু দড়িটা কেমন যেন বশ মানছে না। ফ্র্যাঙ্কেস্টাইনের মতো উলটো কাজ করতে চাইছে। নিজের দড়ি নিজের কোমরে সরি নিজের দল এবং ভাইদের কোমরে পরানোটা কি খুব সহজ কাজ বলুন?

— **সুন্দর মৌলিক**

সিলেবাসে ইতিহাসের বিকৃতি—জাতি ও দেশের পক্ষে জঘন্যতম অপরাধ

ড. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাসের পাঠ্যগ্রন্থে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের বিপ্লবীদের 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দেওয়ায় রাজ্যজুড়ে প্রবল সমালোচনার ঝড় উঠেছে। উনিশ শতকে রাশিয়ায় জারতন্ত্রের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান নিহিলিস্ট বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন নামে পরিচিত। আবার গত শতকের শেষদিক থেকে ইসলামীয় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। ভারতের ভেতরে ও বাইরে থেকে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির উগ্রপন্থী তৎপরতা সন্ত্রাসবাদ বা আতঙ্কবাদ নামে পরিচিত। আর ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে বীরোচিত আপোসহীন রক্তরাঙা সংগ্রাম তাও সন্ত্রাসবাদ বলে বিবেচিত হবে? ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর চোখে বিপ্লবীরা ছিলেন 'রাষ্ট্রদ্রোহী' আর 'সন্ত্রাসবাদী'। কিন্তু এখনও এই শিরোপা কেন? এঁরা রাষ্ট্রদ্রোহী' বা 'সন্ত্রাসবাদী' নন, এঁরা ছিলেন দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের বীর সেনানী। এঁদের অনুভূতি তীব্র দেশপ্রেম সম্পর্কে যাদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি রয়েছে তারা এদের 'সন্ত্রাসবাদী' বলে চিহ্নিত করতে দ্বিধা করবেন। কবির ভাষায় বলা যায়—

"লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে
না রাখে কাহারও ঋণ
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন।"

এত কথা এই জন্য যে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাস পুস্তকের 'অতীত ও ঐতিহ্য'-তে বিপ্লবীদের 'সন্ত্রাসবাদী' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আলোচনায় (পৃ. ১১২-১১৩) দেখানো হয়েছে "জনগণের জন্য প্রকৃত আন্দোলনের কর্মসূচি"র বদলে ব্যক্তিগত 'সন্ত্রাস'-এর পথ নেওয়া হয়েছিল। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর 'কিংসফোর্ড হত্যার চেষ্টা' ছিল এই ধরনের সন্ত্রাসবাদের দৃষ্টান্ত। আসলে ইতিহাসকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা না করার ফলে এই ভ্রান্তি ঘটেছে। বিশ শতকের গোড়াতে জাতীয় আন্দোলন নরমপন্থী (সাংবিধানিক) ও চরমপন্থী (সক্রিয়) ধারায় চলছিল। সক্রিয় ধারার একটি ছিল গণমুখী (স্বদেশ ও বয়কট) আর অন্যটি বৈপ্লবিক যার মধ্যে সশস্ত্র কার্যকলাপ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রকৃত সাম্প্রদায়িকতা ও দেশদ্রোহিতা সম্বন্ধে তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'প্রগতিশীল' দলগুলির মাথাব্যথা নেই। কাশ্মীর নিয়ে তাদের মনে কোনো উদ্বেগ নেই। জাতীয় স্বার্থেই ধর্মের আবরণে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম প্রয়োজন। ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতা সাম্প্রদায়িকতার বিপদ নির্মূল করে না, বরং তার প্রসারে ইন্ধন জোগায়।

ভ্রান্তির উৎস : কিন্তু বিপ্লববাদীদের 'সন্ত্রাসবাদী' তকমা দেওয়ার অপচেষ্টার মূলে রয়েছে সরকারি নথিপত্রের ভাষ্য ও ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন রচনা। সরকারি নথিপত্রে বৃটিশ কর্তারা বিপ্লববাদীদের 'রাষ্ট্রদ্রোহী' ও 'সন্ত্রাসবাদী' নামে চিহ্নিত করত। গোয়েন্দা বিভাগের নথিপত্র ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের গোপন নথিপত্র দেখলে বোঝা যায় যে বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী বলা হয়েছে এবং ঢাকা অনুশীলন সমিতির কিছু সক্রিয়কর্মীকে 'ক্রিমিন্যাল ট্রাইবস অ্যাক্ট'-এ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অর্থাৎ এরা শুধু 'রাষ্ট্রদ্রোহী' নন, এরা ছিলেন উপজাতিদের মতো নিষ্ঠুর ও নৃশংস। এই ধরনের ব্যাখ্যা বৃটিশ আমলাতন্ত্রের সুপরিকল্পিত প্রয়াস। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত বিপ্লবীদের তথ্য নথিপত্র থেকে সংগ্রহ করার পর পুলিশ বিভাগের ছাড়পত্র নিতে হোত। কারণ 'দেশের ও সমাজের নিরাপত্তার পক্ষে এদের কার্যকলাপ ছিল বিপজ্জনক।' মজার কথা হলো, 'সন্ত্রাসবাদী'রা হিংসার অনুরাগী, তাই তারা বিপজ্জনক, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত অহিংস গণআন্দোলনও বৃটিশ কর্তাদের মনে আশঙ্কা সৃষ্টি করেছিল।

স্বাধীনতার পর কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার একপেশে ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাই সচেতন ভাবে বিপ্লববাদকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা হয়। আজাদ বাহিনীর প্রধান নেতা সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বার বার তদন্ত কমিশন এই অপচেষ্টার দৃষ্টান্ত। এমনকী কেন্দ্রীয় সরকার আজাদ হিন্দ বাহিনীর ধৃত সেনাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীর মর্যাদা দিতে চায়নি। এখনও গোপন নথিপত্র শ্রীঅরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় Doctrine of Passive resistance-এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রকাশ্যে আনতে চাইছেন না।

এবার আসি কমিউনিস্টদের কথায়। তারা জাতীয় নেতাদের অবজ্ঞা করেছে, বুর্জোয়া বলেছে। আর নেতাজী তাদের চোখে ছিল ফ্যাসিবাদী এজেন্ট, দেশদ্রোহী। সম্প্রতি অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে বিপ্লবীদের সম্পর্কে 'সন্ত্রাসবাদী' বলায় বামপন্থীরা সোচ্চার হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্য সরকার এই বিষয়ে যে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছেন তার অন্যতম সদস্য অধ্যাপক সুমিত সরকার তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'The Swadeshi Movement in Bengal'-এর নবম অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন 'Early Revolutionary Terrorism'। বিতর্কিত পাঠ্যপুস্তকে বিপ্লববাদ সংক্রান্ত রচনায় সুমিত সরকারের বক্তব্য বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। সুমিত সরকারের বক্তব্য মেনে নিয়ে বলা হয়েছে 'সন্ত্রাসবাদী'রা ছিল বিচ্ছিন্ন এবং তারা 'গণমুখী কর্মসূচি' না নিয়ে 'সন্ত্রাসবাদ'-এর পথে এগিয়েছিলেন। শুধুমাত্র সুমিত সরকার নন, সুমিত সরকারের গ্রন্থ প্রকাশের অনেক আগে অতুল গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত (১৯৫৮ খৃস্টাব্দ) 'Studies in the Bengal Renaissance' শীর্ষক গ্রন্থে মার্কসবাদী চিন্তাবিদ ও লেখক গোপাল হালদার রচিত 'Revolutionary Terrorism' প্রবন্ধে দেখা যায় বিপ্লববাদী আন্দোলনকে তিনিও 'সন্ত্রাসবাদী' বলে চিহ্নিত করেছেন। দুঃখের কথা, সম্প্রতি প্রয়াত ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র তাঁর সম্পাদিত 'India's Struggle for Independence 1857-1947' গ্রন্থের এগারো অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন 'The Split in the Congress and the Rise of Revolutionary Terrorism'। সুতরাং দেখা যায়, বামপন্থী ঐতিহাসিকরা জাতীয় বিপ্লববাদকে 'বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ' আখ্যা দিয়ে নিজেদের সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা কি জানেন না লেনিন, মাও সে তুং, হো চি মিন প্রমুখ সাম্যবাদী বিপ্লবীরা সশস্ত্র আঘাত হেনে জনগণের শাসন কায়েম করতে চেয়েছিলেন?

এর পাশাপাশি স্বদেশী আন্দোলন ও তার সূত্র ধরে উৎসারিত বিপ্লববাদকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী লেখকরা (দৃষ্টান্ত-জ্যালেনটিন চিরল, Indian Unrest) হিন্দু বিদ্রোহ বলে মন্তব্য করেছেন। সুমিত সরকার প্রমুখ মার্কসীয় ভাবনায় প্রভাবিত ইতিহাসবিদগণ পরোক্ষভাবে মুসলমান সমাজের বিরূপতার মূলে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের হিন্দু মানসিকতাকে দায়ী করেছেন। সুমিত সরকার তাঁর স্বদেশী আন্দোলন গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে 'Hindu-Muslim Relations' আলোচনা প্রসঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের হিন্দু নেতাদের দায়দায়িত্ব তুলে ধরেছেন।

সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে ভ্রান্তি :

অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে অষ্টম অধ্যায়ে সাম্প্রদায়িকতার প্রসারে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির নেতিবাচক দিকটি বেশি মাত্রায় তুলে ধরা হয়েছে। এখানেও বামপন্থী ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। এই গ্রন্থের ভাষ্য অনুসারে আলিগড় আন্দোলন হলো মুসলমান সমাজে 'আধুনিক উদার মনোভাব' স্ফুরণের সহায়ক উপাদান। অন্যদিকে মহামান্য মদনমোহন মালব্যকে 'গোঁড়া হিন্দুত্ববাদী' বলা হয়েছে। পুস্তকে বলা হয়েছে ১৯৩০-এর দশকেও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা পরিস্ফুট হয়নি। দুঃখের কথা, ১৯৩০-এর দশকে প্রথমে বৃটিশ সরকার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি ঘোষণা করে এবং মুসলমান নেতৃবৃন্দ এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। ওই সময় থেকেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আগমন ঘটে। মদনমোহন মালব্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখের সমর্থনে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব 'না গ্রহণ, না বর্জন' নীতি গ্রহণ করে পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলেন।

আমার মতামত হলো 'সন্ত্রাসবাদ' ও 'সাম্প্রদায়িকতা' এসব বিষয়ে কোনো বিতর্কিত ভাষ্য না লিখে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য সহজ সরলভাবে ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরা বেশি জরুরি। ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ এসব বিষয় স্থান পেয়েছে, অথচ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ-এর কালজয়ী অবদানের উল্লেখ নেই। বোধকরি সচেতন ভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' প্রসঙ্গ উচ্চারিত হয়নি। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের রণধ্বনি বন্দেমাতরম্ কীভাবে তরুণ সম্প্রদায়কে উদ্বেলিত করেছিল তার উল্লেখ থাকবে না?

১৯৮২ সালে 'বন্দেমাতরম্' নিয়ে সিপিআই(এম) নেতা সরোজ মুখোপাধ্যায় কটূক্তি করেছিলেন, বুঝি সেই ঐতিহ্য এখনও বহাল আছে। তাই অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গ-দেশের কৃষক' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হলেও (পৃ. ৭৩) আনন্দমঠ বা বন্দেমাতরম্-এর প্রসঙ্গ আনা যাবে না? স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' স্থান পেল না অথচ রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা তুলে ধরে পাঠ্যপুস্তকটিকে ভারাক্রান্ত করা হয়েছে।

কিন্তু দুঃখের কথা, প্রকৃত সাম্প্রদায়িকতা ও দেশদ্রোহিতা সম্বন্ধে তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'প্রগতিশীল' দলগুলির মাথাব্যথা নেই। কাশ্মীর নিয়ে তাদের মনে কোনো উদ্বেগ নেই। জাতীয় স্বার্থেই ধর্মের আবরণে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম প্রয়োজন। ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতা সাম্প্রদায়িকতার বিপদ নির্মূল করে না, বরং তার প্রসারে ইন্ধন জোগায়। সম্প্রতি দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় (৩১ আগস্ট ২০১৪) পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের একজন রাজ্যসভার সাংসদের কীর্তি কথা প্রকাশিত হয়েছে। সারদা কেলেঙ্কারির সঙ্গে তাঁর নাম উঠে এসেছে, বলা হয়েছে তিনি নাকি 'সিমি'র শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। এই ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হলে দেখা যাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির মুখোশে আসলে দুর্নীতি, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও রাষ্ট্র-বিরোধিতাকে মদত দেওয়া। বিহারের 'সেকুলার' নেতাদের ভাটকল নিয়ে এতটা সহানুভূতি কেন?

এইরকম পরিস্থিতিতে ইতিহাস-এর পাঠ্যক্রম রচনায় যথেষ্ট সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে ছাত্রছাত্রীদের কিশোর মনে নেতিবাচক ও ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হবে।

পারিবারিক-পরম্পরা পুজো

সংকর্ষণ মাইতি

মহিষাদল রাজবাড়ির দুর্গাপুজো :

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত জনার্দন উপাধ্যায় মহিষাদল পরগনায় একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ওই সময় গুমাই, অরঙ্গানগর, তেরপাড়া, ইটামগরা পরগনার রাজা ছিলেন কল্যাণ রায়চৌধুরি। মহিষাদল পরগনাও তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু একসময় এই পরগনাটি তিনি জনার্দন উপাধ্যায়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কথিত আছে, রাজা কল্যাণ রায়চৌধুরি নবাব দরবারে নিয়মিত রাজস্ব দিতে পারছিলেন না। গেঁওখালির অধিবাসী জনার্দন

মহিষাদল রাজবাড়ির দুর্গাপ্রতিমা।

উপাধ্যায়কে জামিন রেখে অব্যাহতি পান। মহিষাদল পরগনাটি জনার্দন উপাধ্যায়কে দিয়েছিলেন। মহিষাদল পরগনাটি হাতে পাওয়ার পর জনার্দন উপাধ্যায় রঙ্গীবসানে পরিখা-ঘেরা বাসভবন, ধনাগার নির্মাণ করে স্বদেশ থেকে স্ত্রী পুত্র এনে বসবাস করেন এবং একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

উপাধ্যায় বংশের ষষ্ঠপুরুষ আনন্দলাল উপাধ্যায়ের মৃত্যুর (১৭৬৯) পর তাঁর সহধর্মিণী জানকী দেবী ১৭৭০ সালে মহিষাদলের সিংহাসনে বসেন। তিনি বহু দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৭৭৬ সালে একটি রথযাত্রারও সূচনা করেন। ১৭৭৮ সালে রাজগড়ে তিনি দুর্গোৎসবের সূচনা করেন। তাঁরই প্রবর্তিত পুজো এখনও চলে আসছে। তবে সে-সময়কার পুজোর সঙ্গে এখনকার পুজোর মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। উপাধ্যায় রাজবংশের পর মহিষাদল রাজ-রাজত্বে গর্গ বংশ রয়েছেন।

রাজা জগন্নাথ গর্গ, রানি ইন্দ্রাণী দেবী (এঁর বাপের বাড়ি সুতাহাটা থানার বাড় উত্তর হিংলি গ্রামে) রঙ্গীবসান প্রাসাদের ডানপাশে পাকার দুর্গামন্দির তৈরি করে দেন। দুর্গামন্দিরের সামনে পরে একটি নাটমন্দির ও (চণ্ডীমণ্ডপ) হয়েছে। এই নাটমন্দিরের পাশে কাঠের সুন্দর থিয়েটার মঞ্চ তৈরি করে দেন রাজা গোপাল প্রসাদ গর্গ। তিনি ছিলেন নাট্যমোদী। তিনি রাজকর্মচারীদের দিয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। পরে মহিষাদলের অনেক নাট্যামোদী আমন্ত্রিত হয়ে থিয়েটারে অভিনয় করেন। (ধারণা হয়, ১৯২৬ সালের মধ্যে মঞ্চটি হয়েছিল।) দুর্গোৎসবের সময় থিয়েটার হোত। আর রথযাত্রার সময় যাত্রা হোত। উল্টোরথের দিন। এই সময় দুর্গামণ্ডপের দালানটিতে গ্রিনরুম হোত। নাটমন্দিরে যাত্রা। মহেন্দ্রনাথ সান্যাল তাঁর 'মহিষাদলে নাট্যচর্চা' নিবন্ধে লিখেছেন--- রানি জানকীর সময় থেকে রথযাত্রা উপলক্ষে কলকাতার বড় বড় যাত্রাদলের যাত্রাভিনয় হয়ে আসছিল। ...রাজবাড়ির দুর্গোৎসবে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রতিমাগুলি একচালায় অবস্থিত। এবং সাবেকি। এক সময় ভোগের চাল রান্না হোত তিথি অনুযায়ী। সপ্তমীতে সাত মণ, অষ্টমীতে আট মণ, নবমীতে নয় মণ চাল রান্না হোত। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল। এখন প্রয়োজন মতো ভোগরাগ। সন্ধিপুজোর সময় তোপধ্বনি হোত। এখন হয় না। বিজয়া দশমীতে প্রতিমা নিরঞ্জন দেওয়া হোত রূপনারায়ণ নদে। এখন প্রতিমা নিরঞ্জন দেওয়া হয় রাজগড়ের সাহেব দিঘিতে।

বর্তমানে বছর তিনেক হলো রাজবাড়ির দুর্গোৎসবের উদ্বোধন নতুন আঙ্গিকে হচ্ছে। কুমার দেবপ্রসাদ গর্গ, কুমার শক্তিপ্রসাদ গর্গ, কুমার ভূপালপ্রসাদ গর্গ বাহাদুরগণ ছিলেন সঙ্গীত-সাধক। রাজবাড়িতে ভারতের প্রথিতযশা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীরা এখানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। প্রখ্যাত বাদ্যযন্ত্র শিল্পীরাও এসেছেন। রাজবাড়ির সঙ্গীত ঐতিহ্যটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য রাজকুমার শৌর্যপ্রসাদ গর্গ ২০১১ সালের ২ অক্টোবর (১৪ আশ্বিন, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ) দুর্গোৎসবের ষষ্ঠী-সায়াহ্নে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত দিয়ে দুর্গোৎসবের শুভ উদ্বোধনের আয়োজন করেন। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে তমলুক রাজবাড়ির সদস্য দীপেন্দ্রনারায়ণ রায় উপস্থিত ছিলেন। কলকাতা থেকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী ওস্তাদ ওয়াসিম আহমেদ খান সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অশোক মুখোপাধ্যায়, আনোয়ার হোসেন, গৌরব চট্টোপাধ্যায়, অর্ণব বিশ্বাসের সঙ্গে মহিষাদল রাজগড়ের সৌরভ চক্রবর্তীও যন্ত্র-শিল্পী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনে ছিলেন এই নিবন্ধকার। পরের দু' বছর অন্যরা ছিলেন।

আগামীদিনে শঙ্করপ্রসাদ গর্গ, রাজমাতা ইন্দ্রাণীদেবী, হরপ্রসাদ গর্গ, শৌর্যপ্রসাদ গর্গ এবং চন্দনপ্রসাদ গর্গ প্রমুখ রাজবাড়ির এই দুর্গোৎসবকে আরও নতুন আঙ্গিকে রূপ দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছেন। সঙ্গীত তো থাকছেই।

হরিখালিতে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো :

হরিখালিতে মণ্ডলবাবুদের দুর্গাপুজো হলেও তাঁরা থাকেন মহিষাদলে। মহিষাদল রাজ কলেজের পেছনে। হরিখালি মহিষাদল ব্লকের দক্ষিণে হলদি নদীর ধারে অবস্থিত। এক সময় হরিখালি বাজারের নামডাক ছিল। ধান চাল পাটের গুদাম-সহ একটি রাইস মিল ছিল। দুর্গাপুজো, দোল, চড়ক প্রতি বছর হয়ে থাকে। এই সবের মূলে একজন মহীয়সী মহিলা। মণ্ডল বংশের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হলেন নীলমণি মণ্ডল (মহিষাদল রাজ এস্টেটের ম্যানেজার)। এঁর ধর্মপত্নী বিচিত্রময়ী দেবী বাংলা ১৩০০ সালে হরিখালিতে লক্ষ্মী জনার্দন মন্দির, ত্রিলোচন স্ববাক্ষ শিব ও দয়ালেশ্বর শিব মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। দেবদেবীদের পুজোর জন্য ওই এলাকায় জমিজমা দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন। ওই দেবোত্তর সম্পত্তির আয় থেকে দোল, চড়ক, ঝুলন ও দুর্গোৎসব হোত। এক সময় হরিখালির দুর্গোৎসবে বহু মানুষ আসতেন। হলদি নদীর ওপার থেকেও মানুষজন দোকানদানি নিয়ে উৎসবে আসতেন। চারদিন উৎসব উপলক্ষে যাত্রা থিয়েটার ও দানধ্যানের ব্যবস্থা হোত। অষ্টমীরদিন বিকেল থেকে মানুষজন ভিড় জমাতেন চিঁড়ে প্রসাদ নেওয়ার জন্য। নবমীতে গরিব দুঃখী মানুষরা আসতেন চাল, ডাল, পয়সা নেওয়ার জন্য।

অখণ্ড মেদিনীপুরে বড় বড় চণ্ডীমণ্ডপগুলির অন্যতম হলো হরিখালির চণ্ডীমণ্ডপ। চণ্ডীমণ্ডপটি (নাটমঞ্চ) দুর্গামণ্ডপের সঙ্গে যুক্ত। গোলাকার টিনের ছাউনি দিয়ে ঢাকা। উত্তরে দুর্গামণ্ডপ।

রাধাষ্টমীর দিন হলদি নদী থেকে প্রতিমা তৈরির মাটি তোলা হয়। ওই মাটি প্রথমে দুর্গার কাঠামোতে পরে অন্যান্য প্রতিমাতে দেওয়া হয়। পরে অন্য মাটি দিয়ে প্রতিমা তৈরি করা হয়।

মণ্ডলবাড়ির পুজোর বৈশিষ্ট্য হলো, এখানের কুমারী পুজো কেবলমাত্র বাড়ির মহিলাদের দিয়ে সম্পন্ন করা হয়। পুজোতে অন্নভোগ হয় না। দুবেলা ফল, লুচি, সুজি, মিষ্টির ব্যবস্থা। সন্ধিপুজোয় আখ কলা নিবেদন করা হয়।

শতবর্ষ প্রাচীন মণ্ডলবাবুদের দুর্গোৎসব। এক সময় যাত্রা থিয়েটার হোত। গোপালচন্দ্র মণ্ডলের উদ্যোগে থিয়েটারও হয়েছে। তিনি বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে থিয়েটার করতেন। গোপালবাবু মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির প্রথম সভাপতি ছিলেন। দুর্গোৎসবের সময় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে হরিখালিতে থাকতেন। পুজোর সময় নাটমন্দিরের উত্তর দিকে একটি চেয়ারে বসে পুজো আরতি দেখতেন। বহু মানুষ তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। ...এখনও নিষ্ঠার সঙ্গে এখানে পুজো হয়।

কাঁকুড়দার মাইতি বাড়ির দুর্গাপুজো :

হিজলি টাইডাল ক্যানেলের পশ্চিমপাশে মহিষাদল বাজার। পূর্ব পাশে রাজকলেজ এবং রজিগড়। হিজলি টাইডাল ক্যানেল গেঁওখালির কাছে রূপনারায়ণ নদ থেকে সোজা চলে গেছে হলদি নদীতে (কুড়ি কিলোমিটার)। মহিষাদল থেকে ক্যানেল পাড় বরাবর সোজা দক্ষিণে চার কিলোমিটার গেলে ক্যানেল পাড়-সংলগ্ন গ্রাম কাঁকুড়দা। এই গ্রামের জাতীয় বিদ্যালয়ে একসময় বিপ্লবী গুণধর হাজরা, গোরাচাঁদ গিরি, ধীরেন দাস, অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সামন্ত, রমণীমোহন মাইতি এবং শ্রীপতিচরণ বয়াল শিক্ষকতা করেছেন। এঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামী। পরে হাটের ওপর শহিদ গুণধর হাজরার স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি হয়েছে। ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে তৈরি হয়েছিল কাঁকুড়দা জাতীয় বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক কাঁকুড়দার মাইতি পরিবার। মহিষাদল থানার এক বর্ধিষ্ণু পরিবার। লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন (১৯৩০) ও ভারতছাড়ো আন্দোলনে (১৯৪২) এই পরিবার সরাসরি যুক্ত ছিল। এই পরিবারের দুর্গাপুজোও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাইতিদের দুর্গাপুজো দেড়শো বছর পেরিয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠাতা হলেন বৈদ্যনাথ মাইতি। এখনও টিনের ছাউনি, মাটির দেওয়ালযুক্ত মন্দির। সামনে ছোট্ট একটি নাটমন্দির। মাইতিদের প্রতিমাগুলি একচালাতেই। এখানের সন্ধিপুজোয় কিছু না কিছু শুভ ঘটনা ঘটে থাকে। কখনো কখনো জোরালো আলো আসে। মায়ের হাত থেকে ফুল বেলপাতা পড়ে যায়। একবার একটি বড় ধরনের রঙিন প্রজাপতি এসেছিল। সন্ধিপুজোয় মায়ের অন্নভোগ দেওয়া হয়। নবমীতে কুমারী পুজো ও দানধ্যান করা হয়। মাইতি পরিবারের জমিজমা প্রচুর ছিল। রাত্রিকালীন অনুষ্ঠানও হোত। বর্তমানে অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পন্ন- পরিবারগুলিতে কোন অবস্থায় রয়েছে তা সকলে জানেন। তবু পারিবারিক পুজো চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। নিষ্ঠার সঙ্গে এখনও পুজো হচ্ছে।

বাশুলিয়ায় রায়বাড়ির দুর্গাপুজো :

মহিষাদল বাজারের গা ঘেঁসে উত্তর পশ্চিম কোণে বাশুলিয়া গ্রাম। এই গ্রামের রায়-পরিবারের দুর্গাপুজো ২৭৫ বছরেরও ওপর। বিশ্বম্ভর রায় পুজোর প্রবর্তক। আগে মাটির তৈরি মন্দিরে প্রতিমা করে পুজো হোত। তেত্রিশ বছর আগে বাহাত্তর ফুট উঁচু প্যাগোডা সাইজের বিরাট মন্দির হয়েছে। বেদিতে একচালে কংক্রিটের তৈরি দশভুজা দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ। নিত্যপুজোর ব্যবস্থা রয়েছে। শারদোৎসবের সময় ধুমধাম করে পুজো হয়। সপ্তমীতে যে পুকুরে কলাবউ-এর মহাস্নান অনুষ্ঠিত হয় সেই পুকুর সারাবছর ঘেরা থাকে। সকলে ওই পুকুর ব্যবহার করতে পারেন না। পরিবারের সদস্যদের নামে সংকল্প করা হয়। মহানবমীতে কুমারী পুজো। এই কুমারী পুজোর আগেকর দৃশ্যের কথা উল্লেখ করতে হচ্ছে। দেবী দুর্গা যে বছর যে বাহনে চড়ে মর্ত্যে আসেন, সেই বাহন তৈরি করে তার ওপর কুমারী ব্রাহ্মণ কন্যাকে চড়িয়ে দুর্গামণ্ডপে আনা হয়। এক সময় বাহন তৈরি করতে পাঁশকুড়া থেকে মিস্ত্রি আসতেন। নবমীতে অন্নকূটের ব্যবস্থা। বাশুলিয়ার এই রায় পরিবার তমলুকের রাজবাড়িরই রায় পরিবারের বংশধর।

রাজারামপুরে রায়বাড়ির দুর্গাপুজো :

মহিষাদল থেকে চার কিলোমিটার দক্ষিণে রাজারামপুর গ্রাম। জানা যায় এই গ্রামটি রাজা রাজারামের নামানুসারে গ্রামের নামকরণটি হয়েছে। এই পরিবারের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক মাখনলাল রায় জানান— তাঁদের এই রায় পরিবার তমলুক রাজবাড়ির রায় পরিবারেরেই বংশধর। রাজারামপুরে দুর্গাপুজোর প্রবর্তন করেন হরিচরণ রায়। বর্তমানে এই রায় পরিবারের ঘরের সংখ্যা একশো। সুন্দরবনে কেউ কেউ আছেন।

দুশো বছরেরও বেশি রায় বাড়ির দুর্গাপুজোর বয়স। আগে পুজো হোত মাটির মন্দিরে। পটের মাধ্যমে। পটের পর মাটির প্রতিমা। পঞ্চাশ বছর আগে পাকা মন্দির হয়েছে। প্রতিমা গড়ার শিল্পী এই রায়

পরিবারের মধুসূদন রায়। এঁর বাবা অনন্ত রায়ও প্রতিমা তৈরি করে দিয়েছেন। ...রায়বাড়ির পুজো অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে হয়ে থাকে। সন্ধি পুজোয় আখ, কুমড়ো বলি দেওয়া হয় না। অস্ত্রের সাহায্যে শুধু স্পর্শ করা হয়। ভোগরাগ হয় না। পারিবারিক নৈবেদ্যে নিবেদন করা হয় সকাল ও সন্ধ্যায়। পুজোয় চালের ব্যবস্থাও রয়েছে নৈবেদ্য হিসেবে। একসময় কলকাতায় সাবর্ণ রায়চৌধুরিদের দুর্গোৎসবে পুজো করেছেন টাঠারিবাড় গ্রামের ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। ব্যোমকেশবাবু রায় পরিবারেরও শ্রদ্ধেয় প্রণম্য মানুষ। তিনি কয়েক বছর রাজারামপুরের রায়বাড়ির দুর্গাপুজোয় পৌরোহিত্য করেছেন।

বাড় উত্তর হিংলির মিশ্রবাড়ির দুর্গাপুজো :

পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া মহকুমার অন্তর্গত হলদিয়া পঞ্চায়েত সমিতির অধীন বাড় উত্তর হিংলি গ্রামের মিশ্রদের পুজো দ্বিশতাব্দীরও বেশি প্রাচীন। সপ্তদশ শতাব্দীতে অযোধ্যার বান্দা জেলার দরশনা গ্রাম থেকে কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ হিরন্ময় মিশ্র (আগের পদবি মিশির) ব্যবস্থা বাণিজ্যের উদ্দেশে বাংলায় আসেন। মেদিনীপুরের সুতাহাটা থানার বাড় উত্তর হিংলি গ্রামে বসবাস করেন। তিনি ব্যবসা বাণিজ্য করে প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হন (বর্তমানে গ্রামটি হলদিয়া পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত)। তাঁরই আমল থেকে দুর্গোৎসবের সূচনা। ...এই মিশ্র পরিবারের সঙ্গে মহিষাদল রাজপরিবারের আত্মীয়তা গড়ে ওঠে।

মিশ্র পরিবারের সঙ্গে মহিষাদলের রাজপরিবারের মধ্যে বিবাহসূত্রে আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। দয়ারাম মিশ্রের পুত্র বালগোবিন্দ মিশ্র এবং কন্যা ইন্দ্রাণী দেবী। বালগোবিন্দ মিশ্র মহিষাদলের রাজা জগন্নাথ গর্গের মন্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁর ভগ্নি ইন্দ্রাণী দেবীকে জগন্নাথ গর্গ বিবাহ করেন। রানি ইন্দ্রাণী দেবী মহিষাদল রাজগড়ে দুর্গামন্দির তৈরি সহ মহাসমারোহে দুর্গোৎসব করতে রাজাকে অনুপ্রাণিত করেন।

মহিষাদল রাজগড়ে রঙ্গীবসান রাজপ্রাসাদটি জগন্নাথ গর্গ ও রানি ইন্দ্রানী দেবীর আমলে ১৮৪০ সালের মধ্যে তৈরি। এই সময়ের মধ্যে দুর্গামন্দির বা দুর্গামণ্ডপটি তৈরি হয়েছে ধারণা হয়। ১৮২৭ সালে রামমন্দিরটি তৈরি করেন রানি ইন্দ্রাণী দেবী।

মিশ্র বাড়ির দুর্গোৎসব অখণ্ড মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন দুর্গাপুজোর মধ্যে অন্যতম। সাবেকি রীতি বজায় পুজোয়। মায়ের বৈষ্ণবী মতে পুজো হয়ে থাকে। সন্ধি পুজোয় ১০৮টি প্রদীপ জ্বালানো হয়। নবমীতে কুমারী পুজো। পুজোর সময় যাত্রা হোত। অন্নপ্রসাদের ব্যবস্থা থাকত। মানুষজন প্রসাদ পেতেন। এই বংশের অনেকেই এখন বাইরে থাকেন। পুজোর সময় ঘরমুখী।

মহিষাদলে ভট্টাচার্য বাড়ির দুর্গাপুজো :

মহিষাদল রাজগড়ের চারপাশে চওড়া পরিখা। রাজগড়ের উত্তর পশ্চিম কোণে রাস্তা। রাস্তার লাগোয়া জীমূতকান্তি ভট্টাচার্য মশাই-দের বাড়ি। এই বাড়িতেই জীমূতকান্তিবাবুদের দুর্গাপুজো হয়। ছোট্ট একচালাতেই প্রতিমাগুলি।

জীমূতকান্তিবাবুরা তিন ভাই। এঁদের দুর্গাপুজো শতবর্ষ পেরিয়ে গেছে। উত্তর চব্বিশ পরগনার ভাটপাড়ার পুজোকে ধরেই শতবর্ষ। ভাটপাড়া থেকে মহিষাদলে আসার কারণ হলো— হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য মহিষাদল রাজবাড়ির সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর ছেলে নারায়ণ ভট্টাচার্য পরে সভাপণ্ডিত হন। নারায়ণবাবু রাজকুমার সতীপ্রসাদ গর্গ ও রাজকুমার গোপালপ্রসাদ গর্গকে নিয়ে কলকাতায় ১৯১১ সালের আই এফ এ শিল্ডের ফাইন্যাল খেলার দর্শক হয়েছিলেন। পরে গোপালপ্রসাদ গর্গ সতীপ্রসাদ চ্যালেঞ্জকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রবর্তন করেন (আনন্দবাজার পত্রিকায় (৮.২.২০১৪) উল্লেখ— ১৯৫৪ সালে শুরু হয়েছিল)।

ভট্টাচার্য বাড়ির পুজোর প্রতিমার মাটি তোলা হয় বিজয়া দশমীর দিনেই আগামী বছরের পুজোর জন্য। ওই মাটি সংরক্ষণ করে রাখা হয়। জন্মাষ্টমীতে দেবীর কাঠামো পুজো। এরপর প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু।

ভট্টাচার্যদের পুজোয়, বিশেষ করে সন্ধি পুজোয় ১০৮টি পদ্মফুল লাগে। সন্ধিপুজোয় বাড়ির অনেকে উপোস করে থাকেন। প্রতিদিন অন্নভোগ নিবেদন। ...জীমূতকান্তিবাবুরা রামমন্ত্রে দীক্ষিত। নবমীতে রামচন্দ্রের পুজো করা হয়। রামচন্দ্রের অকালবোধন পুজোই আশ্বিনে বাংলা তথা ভারতে এবং বিশ্বের বহু জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়— যা আজ দুর্গোৎসবে পরিণত। কাজেই বহু জায়গায় মহানবমী তিথিতে (শরৎকালীন পুজোয়) রামচন্দ্রেরও পুজো হয়। ভট্টাচার্য বাড়িতে মহানবমীতেও রামচন্দ্রের পুজো করা হয়।

মহিষাদল ব্লকে আরো কিছু পারিবারিক পুজো হয়ে থাকে। মহিষাদলে ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ ভূঞাবাবুদের পুজো, অপূর্ণ মাইতি বাবুদের পুজো নিয়মনিষ্ঠার মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে। প্রখ্যাত ডাক্তারবাবু সত্যেন্দ্রনাথ ভূঞা মহিষাদল গার্লস কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। নন্দকুমার ব্লকের রাজনগরে আদি বাড়ি হলেও তিনি বহুদিন ধরে মহিষাদলের অধিবাসী। তিনি মহিষাদলে পারিবারিক দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। প্রয়াত হয়েছেন। তবে যথারীতি পুজো হচ্ছে এখনও।

মহিষাদল বাজার থেকে বেশ দূরে কেশবপুর গ্রামের মাইতিদের দুর্গাপুজো শতাব্দীপ্রাচীন। এঁদের পুজোয় পশুবলির ব্যবস্থা রয়েছে। ঘাসিপুরে দাসেদের বাড়ির দুর্গাপুজোও বহুদিনের।

বর্তমানে সর্বজনীন পুজোতে প্যান্ডেল, আলোর রোশনাই মানুষকে আকৃষ্ট করছে ঠিকই, তবে পারিবারিক পুজো মানুষকে টানে। আসলে প্রাচীনত্ব এবং ঐতিহ্য মানুষকে টেনে আনে এখনও।

তথ্যসূত্র :

মহিষাদল ও রাজকাহিনী--- বঙ্কিম ব্রহ্মচারী।

মহিষাদল স্মরণিকা— ২০১১।

মহিষাদলের মফস্‌সল এলাকার কয়েকটি পারিবারিক দুর্গাপুজো— সংকর্ষণ মাইতি/ সাপ্তাহিক বর্তমান ৫.১০.২০০২।

ব্যক্তিগত যোগাযোগ :

শিবেশ চক্রবর্তী (মহিষাদল), অরূপ রায় (বাশুলিয়া), ক্ষিতিশচন্দ্র মাইতি ও পঞ্চানন মাইতি (কাঁকুড়দা), স্বপ্না মণ্ডল (মহিষাদল), মাখনলাল রায় (মহিষাদল), জীমূতকান্তি ভট্টাচার্য (মহিষাদল), হরপ্রসাদ সাহু (মহিষাদল), সতুগোপাল ভট্টাচার্য (সুন্দরা), স্বপন চক্রবর্তী (মহিষাদল)। ■

বাঁকুড়ায় পটচিত্রে দুর্গাপূজা

মেঘদূত ভুঁই

যে সকল উপাদানে দুর্গা প্রতিমা নির্মিত হয়ে থাকে তার মধ্যে মৃত্তিকাই হলো অন্যতম। শিলা, দারু, ধাতু, চিত্রপট ছাড়াও চাল, ডাল, কলাই, কাগজ, খড়, ডিমের খোলা, সুতো প্রভৃতি উপাদানে দুর্গা প্রতিমা নির্মিত হচ্ছে। অদ্যাবধি প্রতিমা নির্মাণে যে সকল উপাদান ব্যবহৃত হয় তা কিন্তু শাস্ত্রবিরোধী নয়। কারণ ভাগবতে বর্ণিত আছে যে,

"শৈলী দারুময়ী লৌহী
লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী
প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা।"

—অর্থাৎ দেবীমূর্তি নির্মাণের উপাদানগুলি হলো— শিলা, দারু, সুবর্ণ কিংবা অন্য ধাতু, মৃতচন্দন, চিত্রপট, বালুকা, মণি এবং মনোময়ী। 'মনোময়ী' বলতে শিল্পী ও সাধকের কল্পনায় যা ভালো লাগবে তাই দিয়েই বিগ্রহ বানানো যাবে।

পট ও পটের দুর্গা :

পূর্বে দারু ও শিলা নির্মিত দুর্গামূর্তির প্রচলন ছিল বেশি। তারপর বঙ্গের রাজন্যবর্গ এবং জমিদারবর্গের মধ্যেই পটচিত্রে দুর্গাদেবীর আরাধনা শুরু হয়। 'পট' কথাটি এসেছে মূলত 'পট্ট' শব্দ থেকে। 'পট্ট' মানে বস্ত্র বা কাপড়। অনেকেই মনে করেন 'পট' কথাটি তামিল শব্দ 'পড়ম' থেকে উদ্ভূত। পট তৈরি করা হয় সুতির কাপড়ে আঠা লাগিয়ে। আঠা লাগানোর পর আবছা রোদে শুকিয়ে শক্তপোক্ত খড়খড়ে করা হয়। সাধারণত পটুয়ারাই পট বানাতে পারে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুমোররাও পট বানিয়ে থাকে। 'পটুয়াটোলা' নামটি এসেছে পটুয়াদের বসতিস্থাপনের কারণে। পূর্বে পটুয়ারা নানা প্রকার গাছ-গাছালির নির্যাসে এবং ইট ও অঙ্গারকে মিহি করে ঘষে নানাবিধ রঙ প্রস্তুত করত। এই রঙে পট অধারে (ক্যানভাস) তুলির টানে দুর্গা ও তাঁর পরিবার পরিজনদের ভিন্ন গঠনশৈলীর চিত্র অঙ্কন করত। পটে আঁকা এই চিত্রকেই 'পটচিত্র' বলা হয়। এই পটচিত্রকে সামনে রেখে দুর্গাপূজা করাকেই পটের দুর্গাপূজা বলা হয়।

পটে দুর্গাপূজার প্রবর্তন :

এমন প্রশ্ন হলো, অবিভক্ত বঙ্গে দুর্গাপূজার প্রবর্তক কে? উত্তরে বলা যায় মল্লভূমের (বিষ্ণুপুর) ৫১তম মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ পটে দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন ১৬৪৩—১৬৫৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে। তিনি মহারাষ্ট্রের গুহাচিত্রের কারুকার্যে প্রভাবিত হয়ে পটুয়াদের দ্বারা পটচিত্র আঁকাতে উৎসাহী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক রাজবংশ, জমিদারগোষ্ঠী ও পারিবারিক পূজাতেও পটপূজার অনুপ্রবেশ ঘটে। বর্ধমানের রাজা ত্রিলোকচাঁদ রায়ের মৃত্যুর পর (১৭৪৪—১৭৭০ খৃস্টাব্দ) তাঁর পত্নী বিষণকুমারী বর্ধমান রাজপরিবারে পটে আঁকা দুর্গামূর্তির পূজা শুরু করেছিলেন। সেইজন্য এই দুর্গামূর্তির নাম হয় 'পটেশ্বরী'। বাঁকুড়া জেলায় বেশ কয়েকটি রাজবংশে ও জমিদার পরিবারে আজও পটচিত্রে দুর্গাদেবীর আরাধনা হয়ে থাকে।

(১) মাঝডিহা মহাপাত্র বাড়ির পটের দুর্গা (ওন্দা, বাঁকুড়া) :

মল্লভূম রাজবাড়ির দুর্গা প্রতিমা, মৃন্ময়ীদেবীর মূর্তির আদলে মাঝডিহা মহাপাত্র পরিবারে পটের দুর্গা পূজিতা হন মহা-সাড়ম্বরে। দশভুজা দেবীদুর্গা এখানে চামুণ্ডারূপে আরাধিতা। সিংহ ও মহিষাসুরের উপর দেবী দণ্ডায়মানা, হাতে পদ্ম, সর্প এবং ত্রিশূল। পটচিত্রের উচ্চতা প্রায় ৪'৫', প্রস্থ প্রায় ২'৫"।

এই পূজার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি হলো—

(১) জিতাষ্টমীর দিন প্রথম বোধন হলেও দ্বিতীয় বোধনটি অনুষ্ঠিত হয় ষষ্ঠীর দিন। মধ্যবর্তী দিনগুলিতে ঝিঙে-চুনোমাছ-সহ (ছোটমাছ) ১৩ রকমের তরকারি দিয়ে দেবীর ভোগ সম্পন্ন হয়।

(২) সপ্তমীর দিন সকালে একই দোলায় দু'টি কলাবউ আনা হয় এবং পটচিত্রের দু'দিকে কলাবউ দু'টিকে স্থাপন করা হয়। দু'দিকে দু'টি জাগরও প্রজ্বলিত থাকে।

(৩) তন্ত্রধারক একজন থাকলেও দু'জন ব্রাহ্মণপূজারি পূজা করে থাকেন।

(৪) বিজয়ার দিন সর্বশেষ অনুষ্ঠান হিসাবে 'দুগ্ধ-কুসুম্বা' বিতরণ করা হয়। 'দুগ্ধ-কুসুম্বা'— অর্থে দুধ, গুড়, টানামিঠাই, লুচি, সিদ্ধি (নেশার দ্রব্য) ইত্যাদি মিশ্রণের একপ্রকার তরল পানীয়। এই পানীয় বিজয়ার বিসর্জনের পর কিংবা সন্ধ্যায় বড়োরা পান করে থাকেন।

পূজা প্রতিষ্ঠার ঘটনাটি এরকম— মল্লরাজের রাজপুরোহিত ছিলেন এই বংশের জনৈক ব্যক্তি। সেজন্য তাদের 'মহানপাত্র' বলা হোত। 'মহানপাত্র' পরবর্তীকালে 'মহাপাত্র'-এ পরিণত হয়েছে। পুরোহিত মশাই নিজের বাড়িতে দুর্গাপূজা করতে চাইলে, মল্লরাজ ১৯৯ বিঘা 'নাগরাজ' (নিষ্কর সম্পত্তি, মৌজা-মাঝডিহা, জে. এল. নং-২৯৪) জমি দান করেন। প্রথম থেকেই এখানে পটচিত্রে দেবীর পূজা শুরু হয়। মহাপাত্র বংশের জানকীনাথ মহাপাত্রের কথায়, তাঁদের দুর্গাপূজা আজ থেকে প্রায় ৪০০ বছর আগে চালু হয়। ৪০০ বছরের পূর্বের পটটি আজও পূজিত হচ্ছে। তবে দীর্ঘ ব্যবহারের ফলে পটটি জীর্ণ হয়ে পড়েছে।

(২) **বিশালাক্ষী মায়ের পটপূজা (ভূতশহর, বাঁকুড়া) :**

মল্লরাজ রঘুনাথ মল্লের আমলে শোভা সিংহ (শাকরোয়া বরগুজন জাতি/রাজপুত ক্ষত্রিয়) নামক এক ব্যক্তি বানভাসির ভয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল এলাকার শিতোয়া-বরোদা গ্রাম থেকে বাঁকুড়া জেলার ভূতশহরে আসেন। এই বংশের কন্যার সঙ্গে রঘুনাথ মল্লের বিবাহ হয়েছিল। সেই সূত্রে মল্লরাজ সিংহ পরিবারকে ৭টি মৌজাসহ ভূতশহরে বসবাসের অধিকার দেন। সিংহবংশের কুলদেবতা হলেন বিশালাক্ষী দেবী। শোভা সিংহ স্বপ্নাদেশ পেয়ে বিশালাক্ষী দেবীর 'ঘটে-পটে' পূজার প্রচলন করেন।

দেবীকে এখানে দুর্গা হিসাবেই আরাধনা করা হয়। কলাবউ আনা হয় সপ্তমীদিনে। সপ্তমীতে একটি কুমড়ো, অষ্টমী ও নবমীতে কুমড়ো এবং ছাগ বলির বিধি আজও পালিত হয়। এই পূজার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো— বিজয়ার দিন সিংহবাড়ির সকল পুরুষ সদস্য যুদ্ধে যাওয়ার মতো ঢাল, তলোয়ার, বর্শা, তির-ধনুক নিয়ে বিসর্জনের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। এক ক্যুইন্টাল আতপচালের ভোগ নিবেদিত হয়। পূর্বে অষ্টমীর সন্ধিক্ষণের বলিদানের পর তোপধ্বনি করা হোত। তাই তোপধ্বনি শুনে পার্শ্ববর্তী গ্রাম-কাটনাড়, তেল্যাবেড়া প্রভৃতি এলাকায় বলিদান সম্পন্ন হোত। কিন্তু এখন আর তোপধ্বনি হয় না।

বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় থানার বারাবেন্দ্যা গ্রামে এবং ওন্দা থানার চৌকিমুড়া গ্রামেও পটের দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বংশপরম্পরায়। প্রবন্ধকে দীর্ঘায়িত না করে জগজ্জননী মায়ের পায়ে প্রণাম জানাই—

"(ওঁ) আয়ুর্দ্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতী দেহি মে।

পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে।।" ■

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর, মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

চিঠিপত্র

বাঙ্গালির চরিত্রায়ন

কঠোর বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হওয়ার সাহস বাঙ্গালির নেই, বীরত্ব তার চরিত্রে চিরদিনই অধরা। যতটা গোঁয়ার একরোখা, ততটা কর্তব্যনিষ্ঠ দৃঢ়চেতা নয়। আদর্শে আছে, সেটা রূপায়ণ আন্তরিকতায় নেই। চোখ বন্ধ রাখলেই কি ভয়ঙ্কর প্রলয়ঝঞ্ঝা এড়ানো যায়! বিকল্পের স্বপ্ন কল্পনা আছে, কিন্তু বাস্তবে তাকে নিয়ে চলার একাগ্র ঐকান্তিক ইচ্ছা নেই। আমার নিঃসঙ্গ চাকরি জীবন প্রবাসে কেটেছে। অবসরের আগেই ফিরেছি বাংলায়, নিজগ্রামে। প্রবাসে আমরা বাঙ্গালিদের স্বতন্ত্র মহাগৌরবের মর্যাদাপূর্ণ পৃথক সম্ভ্রমের বিশ্বস্ত জায়গা ছিল, আজ সেটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। বরং ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ এবং শ্লেষে জানাই, পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙ্গালিদের এখনকার ডিগ্রীর কোনো যথার্থ শিক্ষাশিক্ষণ মূল্য নেই। বাঙ্গালি সমাজটাই একচক্ষু হরিণের মতো রাজনীতিকরণে পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, জরদ্গব। এখনো এখানে দলীয় ইজম শাসিত বিশ্ববিদ্যালয়, পার্টি নিবেদিত উৎসর্গীকৃত ভক্তকর্মী, আজানু পার্টি সমর্পিত অধ্যাপক, অনুগত জো-হুজুর ক্রীতদাস উপাচার্যবৃন্দ। একদা আই সি এস ভারতীয়দের মধ্য থেকেই প্রথম এবং শেষজনও বাঙ্গালি (প্রথম সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শেষজন নির্মল মুখোপাধ্যায়, প্রথম ক্যাবিনেট সচিবও) ছিলেন। সর্বভারতীয় শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতায় আজকাল সেই বাঙ্গালিদের আই এ এস— আই পি এস— আই এফ এস এ দূরবিনযন্ত্রেও দেখা মেলে না কেন, যখন পদের সংখ্যা প্রায় ১২৫০-র মতো, সংখ্যা প্রয়োজনে বাড়ে ও কমেও? সর্বভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় টপার (১০-১০) হওয়া আজকাল বাঙ্গালির কল্পনাতীত। এই অধঃপতনের ধস অনুভব, বোধ বিশ্বাস আত্মনিষ্ঠায় বিশ্লেষণের বিষয়।

বাঙ্গালির আরাধ্য শুধু ঠুনকো পরনির্ভরতা। নিজের পায়ে সোজা মেরুদণ্ড টানটান দাঁড়ানোর দৃঢ় অভ্যাস আজ বাঙ্গালিদের নেই। বাঙ্গালির চোখ আছে, দৃষ্টি নেই। পথ আছে, অনুসন্ধানের শিখর বিশ্বাসে আস্থা নেই। বাঙ্গালির মত আছে, নীতি নেই। অজস্র প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে একাগ্র কর্তব্যনিষ্ঠার স্বীকৃতি নেই। বাঙ্গালির ধর্ম আছে, দরদি নিরপেক্ষ চর্চা নেই। জাগরণ আছে, উত্তরণের ব্যাপক প্রস্তুতির প্রেরণা নেই। শক্তি আছে, সাহসের অন্তর্নিহিত তেজ নেই। বোধ আছে, স্বপ্নপূরণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নেই। প্রগতির অদৃশ্য পতাকাতলে ভাণভণিতায় বাঙ্গালি তুখোড় সভ্যতা শববাহকের মৌন ভূমিকায় মুখর আত্মপ্রচারক। তর্কের মাধ্যমে বাঙ্গালি বিশ্বজয়ে বিশ্বাসী, অধ্যবসায় অদৃশ্য। শাসক পার্টির ফললোভী সুজন সখা বনতে গিয়ে ভাঁড়, বিদ্রূপের পাত্র হয়ে গেছে বাঙ্গালি। বাংলাকেই মোক্ষ ভেবেছে, ধর্মে মক্কা, কর্মে ফক্কা, বাংলাই ভারত, বাংলাই দেশ, এই তার স্বদেশচিন্তা। স্বদেশ ভাবনা আছে, কিন্তু স্বদেশের জন্যে ত্যাগ স্বীকারে দৃঢ়তা নেই। সমস্ত ভাবনাচিন্তাতেই স্বআরোপিত মূল্যায়ন হাজির, ঠিক যেন অন্ধের হস্তী দর্শনের মতো অলীক, নিজস্ব, মনগড়া চিন্তা। প্রচারপটু গোয়েবলস কায়দায় মনোভাব, আহা রে! বেঁচে আছে বেশ। বাঙ্গালিকে এখন চিনতে হবে সাফল্যের অর্জুন চোখ একাগ্র সাধনায় বা একলব্যের একক সুকঠিন আত্মমগ্ন তপস্যার ধ্যানময়তায়। নাহলে আংশিকও পরিত্রাণ নেই বাঙ্গালির!

—**প্রমথনাথ সিংহরায়,**
সেঁতা-তারকেশ্বর-৭১২৪১০, হুগলী।

জেহাদি খলিফাতন্ত্র

মুসলমান সন্ত্রাসবাদীরা খলিফাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে সভ্যতাকে ধ্বংস করার নেশায় মেতে উঠেছে। ইরাকের জঙ্গি সংগঠন আই এস আই এস (ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া) এখন গোটা বিশ্বের ত্রাস। আই এস আই এস জঙ্গিরা যে আল-কায়দার থেকেও বড় ত্রাস তা স্বীকার করেছে আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ইত্যাদি পশ্চিমী দুনিয়ার দেশগুলি। এরা আন্তর্জাতিক ভাবে জঘন্য অপরাধমূলক এই জঙ্গি সমস্যার সমাধান করতে চায়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে এদের মুখ এবং মুখোশ সঠিকভাবে বুঝে ওঠা দুষ্কর হয়ে ওঠে। ইরাক এবং সিরিয়ার শাসকদেরও এরা সন্দেহের চোখে দেখে। এরা মনে করে ইরাকে সর্বস্তরের বাসিন্দাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারার মতো সরকারের ক্ষমতায় আসা দরকার, যা এখন ইরাকে নেই। কিন্তু তদারকি প্রধানমন্ত্রী নুরি-আল-মালিকির সে ব্যাপারে কোনোরকম কার্যকরি ভূমিকা নেই। অন্যদিকে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাসার-আল-আসাদ প্রসঙ্গে এদের ধারণা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আসাদ সঠিকভাবে লড়ছে না, যে ভাবে লড়ছে তা হলো লোক দেখানো। পশ্চিমী দেশগুলোকে ঠিকমত সাহায্যও করছে না। জিহাদিদের সঙ্গে আসাদের বন্ধুত্ব আছে বলে ওই দেশীয়রা মনে করে। আদপে হয়তো মোল্লাতন্ত্র বা খলিফাতন্ত্রকেই আসাদ নিজের দেশে কায়েম করতে চায়।

২০১১ সালে সিরিয়ার লড়াই শুরু হওয়ার পর থেকে জঙ্গিরা বহু বিদেশি সাংবাদিক অপহরণ করেছে। কট্টর সুন্নিপন্থী, মোল্লা- মৌলবাদী খলিফাতন্ত্রে বিশ্বাসী আই এস আই এস যে নৃশংস হত্যালীলা চালাচ্ছে তা তারা ভিডিও করে ইনটারনেটের মাধ্যমে বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে। বিশ্বত্রাসী আই এস আই এস-এর ধর্মান্তরকরণ এবং তার আদর্শ (!) বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে সমর্থন পাচ্ছে।

ঈদের নমাজের পর শ্রীনগরের পুরনো শহরে মুখোশপরা বিক্ষোভকারীদের হাতে দেখা গিয়েছে আই এস আই এস এবং আল-কায়দার ব্যানার-পোস্টার। লস্কর-ই-তইবা, জইশ-ই-মহম্মদ, জম্মু-কাশ্মীরের সক্রিয় পাকিস্তানি সংগঠন, আল-বদর, আল-কায়দা এরপর নতুন সংযোজন আই এস আই এস। অদম্য ইসলামি জেহাদিরা, খলিফাতন্ত্রে বিশ্বাসীরা আগামীতে বিশ্বব্যাপী নতুন জিহাদের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। মনে রাখতে হবে, সকলের দিকেই তাক্ করা আছে জঙ্গি-বুলেট।

তাই প্রতিটি বুলেটকে রুখবার জন্য ঘরে

ঘরে অভিভাবকদের ছেলে-মেয়েদের প্রতি নজর রাখতে হবে।

—**অমিত ঘোষ দস্তিদার,**
সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

মুসলমানদের আত্মসমীক্ষা

বিশ্ব আবার অশান্ত হয়ে উঠেছে। লড়াই আমেরিকা বনাম মুসলমান দেশসমূহের। সারা পৃথিবীতে মুসলমান জনগণ আজ মহা অশান্তিপূর্ণ পরিবেশে বাস করছে। কারণটা তাদের মাতব্বরেরা বুঝছেন না। পৃথিবীর সকল ধর্মের পরিবর্তন হয়েছে, অথচ ইসলামের পরিবর্তন নেই। মুসলমানদের কাছে এটা গর্বের, কিন্তু বাকিদের কাছে তা আশ্চর্যের। পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেকে পরিবর্তন না করলে তার বাঁচা সম্ভব নয়। পৃথিবীতে যত জঙ্গিগোষ্ঠী আছে তার সিংহভাগ ইসলামিক। কেন? এই সমস্ত জঙ্গিপনার বিরুদ্ধাচরণ করে কোনো শিক্ষিত মুসলমান লেখালিখি করেন না। আত্মসমালোচনামূলক লেখা তাঁদের কলম থেকে বের হয় না। আবার বিধর্মী কোনো লেখক মুসলমানদের সমালোচনা করলে জাতি-দাঙ্গাবাজ বলে পরিচিত হন; এমনকী তাঁর মাথার দাম ঘোষণা হয়ে যায়! ইসলামের বিরুদ্ধে কলম ধরা তসলিমা নাসরিনের পাশে কয়জন মুসলমান দাঁড়িয়েছে? শিক্ষিত মুসলমান যুব সম্প্রদায়ও সোসাল মিডিয়া সাইটগুলিতে ইসলাম অবমাননার প্রতিবাদ করে, অথচ ধর্মের দোহাই দিয়ে যারা মুসলমান জাতিটাকে দিনকে দিন ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও বহু মুসলমান স্বৈরাচারী শাসক দেশ শাসন করছে। নিজেরা হারেম রাখছেন অথচ শরিয়তি আইন দ্বারা বিচার চালাচ্ছেন। প্রতিবাদ নেই মুসলমান জনগোষ্ঠীর পক্ষে। অন্যদিকে স্বদেশীয় স্বধর্মী শাসক দ্বারা অত্যাচারিত মুসলমাদের বাঁচানোর নামে ব্যবসায়িক লক্ষ্যে ইরাক, আফগানিস্তান আক্রমণ করছে আমেরিকা। বিশ্বজুড়ে চালাচ্ছে অস্ত্র ব্যবসা। ভ্রান্ত ধর্মনীতি ও মধ্যযুগীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, মধ্যযুগীয় মানসিকতায় আচ্ছন্ন একটা জাতিকে ভিন জাতীয় নেতৃত্ব কীভাবে মুক্তি দেবে! নিজেদের দুর্দশার জন্য অন্য সম্প্রদায়কে দায়ী করার মানসিকতাও রয়েছে, যা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মুসলমান জনগণের অন্যতম সমস্যা। এই কারণে এই দেশসমূহে তাদের নিয়ে বেশি রাজনীতি হয়। তাঁরা তা বোঝেন না, নাকি না বোঝার ভান করেন, বোঝা মুশকিল। যেমন ভারতে ৬৭ বছর ধরে মুসলমান দরদের নামে কত রাজনীতি করলো ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি, স্বাধীনতার নামে ধর্মের ধুয়ো তুলে মুসলমানদের নিজস্ব হোমল্যান্ড' পাকিস্তান বানিয়ে দিল। ভারতীয় মুসলমানদের চেয়ে পাকিস্তানবাসীদের খুব বেশি কি উন্নতি হয়েছে? আজো পাকিস্তানি মুসলমানরা রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন। বাংলাদেশকে 'হিন্দু মুক্ত' এলাকা বানাতে এখনো হিন্দু খেদাও অভিযান চলছে। অন্যধর্মের মূলোৎপাটন হলেই কি মুসলমানদের উন্নতি হয়ে যাবে! এমন ভ্রান্ত বুদ্ধি নিয়ে আর যাই হোক, 'ইসলামিক বিশ্ব' বানানো যায় না। কিন্তু এসব হচ্ছেটা কী! কি ভাবছে বৃহত্তর ইসলামিক সমাজ? তাঁরা কি ভারতের ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী চাগলা সাহেবের মতো বলতে পারবেন— "I am Muslim by religion and Hindu by race"?

—**বরুণ মণ্ডল,**
রাণাঘাট, নদীয়া।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

একটি ইংরেজি দৈনিকের খবরে প্রকাশ গত ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৪-এ ৮০০ বছর পরে বিশ্ববিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে দরজা খুলছে। এই খবর পড়ে আমরা গর্বিত ও আনন্দিত। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বের শুরুতে গৌরবময় প্রাচীন ভারতের অন্যতম জ্ঞান-চর্চার পীঠস্থান পুনরায় যাত্রা শুরু করল। নির্বোধ ও অন্ধবিশ্বাসীরা ভেবেছিল বিশ্ববিদ্যালয় ও তার জ্ঞানভাণ্ডার পাঠাগার আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে এবং মুণ্ডিত মস্তক জ্ঞান-সাধকদের (বৌদ্ধ পণ্ডিত) হত্যা করলেই পৃথিবীতে অন্ধ-বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা হবে এবং সত্যানুসন্ধানের পথ ধ্বংস করা সম্ভব। কিন্তু বেদের বাণী— সত্যই বড়। সত্য অবিনশ্বর। আমরা আশা করব প্রাচীন ভারতবর্ষ অতীতে যেমন সত্যানুসন্ধানে মগ্ন ছিল সেই রকমই আবার নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় মানবজাতির কল্যাণে জ্ঞানের সাধনায় মগ্ন হবে।

১২০৪ সালে বাঙলা দখলের পূর্বে বক্তিয়ার খিলজী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগার জ্বালিয়ে দেয় এবং মুণ্ডিত মস্তক শিক্ষকদের হত্যা করেছিল। এই ধ্বংসের ইতিহাস আমরা জানি (Tabakat-I-Nasiri পৃষ্ঠা 552-54.)। ঐতিহাসিক Minhaj-Ud-Din লিখেছেন —'...that band of holy warriors when they reached the getway (of the University which they mistakenly thought, a fortress) of the fortress and began the attack at which time Muhammad-i-Bakhtyar by the force of his intrepidity, thresd himself into the postern of the gateway of the palace, and they captured the fortress and acquired great booty. The greater number of inhabitants of that palace were Brahmans and the whole of those Brahmans had their heads shaven; and they were all slain. There were a great number of books there; and when all these books came under the observation of the Musalmans they summened a number of Hindus that they might give then information respecting the import of those books; but the whole of the Hindus had been killed. On becoming acquinted, it was that the whole of the fortress and city was a College in the Hindus tongue, they call a College Bihar' (From the Tabakat-i-Nasiri p. 551-2). এই বিশ্ববিদ্যালয় বিহারের রাজগির জেলায় অবস্থিত। ভারতবর্ষের ট্র্যাডিশন যুগ যুগ ধরে সমানে যাতে চলে এটাই প্রার্থনা।

—**ড. শ্রীকৃষ্ণকান্ত সরকার,**
কলকাতা-৫৫।

হাওড়ার রামরাজাতলার দেবী কাত্যায়নী

উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল

জগজ্জননী মা দুর্গার ন'টি রূপ ও ভাব। তার মধ্যে ষষ্ঠ রূপ কাত্যায়নী। মহর্ষি কাত্যায়ন এই দেবীর প্রথম অর্চনা করেন বলে এর নাম কাত্যায়নী। দশভুজা সিংহবাহিনী দেবী আশ্বিনের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে সৃষ্ট হন; শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমীতে ঋষি কাত্যায়নের পূজা নিয়ে দশমীতে মহিষাসুরকে বধ করেন। দেবীর রূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

চন্দ্রহাসোজ্জ্বলকরা শার্দুলবরবাহনা।
কাত্যায়নী শুভং দদ্যাদ্‌দেবী দানবঘাতিনী।।

শ্রীধাম বৃন্দাবনের গোপবৃন্দের আরাধ্য দেবতা মথুরার ভূতেশ্বর মহাদেব আর এই কাত্যায়নী। ভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে গোপীদের কাত্যায়নী পূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। বৃন্দাবনের গোপকুমারীগণ হেমন্তকালে এক মাস ধরে অতি প্রত্যুষে উঠে যমুনার জলে স্নান করে শুচি শুদ্ধ হয়ে হবিষ্য আহার করে বালির দুর্গামূর্তি তৈরি করে নানা পুষ্পপত্র ধূপ দীপে মহাশক্তি কাত্যায়নীর আরাধনা করতেন। তাঁদের প্রার্থনা মন্ত্র :

কাত্যায়নি! মহামায়ে মহাযোগীন্যধীশ্বরী
নন্দগোপসূতং দেবী পতিং মে কুরুতে নমঃ

হে কাত্যায়নি, হে মহামায়ে, হে মহাযোগিনী, হে অধীশ্বরী দেবী, নন্দগোপের পুত্রকে আমার পতি করে দাও।

বৃন্দাবন মিউনিসিপ্যাল অফিসের ডানদিকে রাধাবাগে দেবী কাত্যায়নীর মন্দির। মন্দিরে অষ্টধাতু নির্মিত উজ্জ্বল দশভুজা মহাদেবীর মূর্তি অধিষ্ঠিত। দক্ষিণ চরণ সিংহের পিঠে, বামচরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি মহিষাসুরের দক্ষিণ স্কন্ধে রেখে দেবী দণ্ডায়মান। দেবীর দশটি হাতের মধ্যে একটি হাতে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম, দেবী বৈষ্ণবভাবাপন্ন, দেবীর কোমল বৈষ্ণবী ভাব।

নিত্যকিশোর নিত্যকিশোরী রাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলাস্থলী হলেও বৃন্দাবন অন্যতম শক্তিপীঠও। দক্ষযজ্ঞকালে সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেব যখন সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করেছিলেন তখন বিষ্ণুচক্রে কর্তিত হয়ে সতীর দেহের নানা অঙ্গ নানা স্থানে পতিত হয়েছিল। লোকপ্রসিদ্ধি, সতীর কেশপাশ এখানে পড়েছিল, এখানে রক্ষিত আছে সতীর প্রস্তরীভূত কেশপাশ। আদ্যাস্তোত্রে বলা হয় 'ব্রজে কাত্যায়নী পরা'— ব্রজেরই তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তবে ব্রজের বাইরেও দেবী স্বমহিমায় বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছেন, যেমন হাওড়া শহরের রামরাজাতলায় দেবী কাত্যায়নী বহু বছর ধরে পূজিত হয়ে আসছেন। দেবী অবশ্য শ্রীধাম বৃন্দাবন থেকেই আনীত। তবে বৃন্দাবন থেকে হাওড়া আসার মধ্যে আছে এক নাটকীয় ইতিহাস। দেবী অনেক ঘাট ঘুরে এখন রামরাজাতলার চক্রবর্তী পরিবারের পারিবারিক মন্দিরে স্থিতু হয়েছেন। অবিভক্ত বাংলাদেশের বিক্রমপুরের জমিদার রামপ্রসাদ তীর্থদর্শনে একবার বৃন্দাবনে যান। অন্যান্য মন্দিরের সঙ্গে তিনি দেবী কাত্যায়নীর মন্দিরও যান। কাত্যায়নী দর্শন করে তাঁর ইচ্ছা হয় এরকম এক বিগ্রহ দেশে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করবেন। এরকম এক বিগ্রহ তিনি পেয়েও গেলেন এবং পদ্মার তীরে সোমকূট গ্রামে প্রতিষ্ঠা করলেন। তখন তিনি এই গ্রামেই থাকতেন। কিন্তু কয়েক বছর পর সে গ্রাম পদ্মার গর্ভে তলিয়ে গেলে রামপ্রসাদবাবু পার্শ্ববর্তী মূলগাঁও গ্রামে বসবাস শুরু করেন। যদিও তিনি সেখানে বেশিদিন থাকতে পারলেন না। রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার জন্য সেখান থেকে সপরিবারে দেশত্যাগ করে এই বাংলায় হাওড়া শহরের কাছে এক গ্রামে আশ্রয় নেন। তখন রামপ্রসাদবাবুর অবস্থা অনিশ্চয়তায় ভরা। এর উপর আছে দেবী কাত্যায়নীর নিত্য পূজার দায়দায়িত্ব। জীবনের এই বিব্রত অবস্থায় রামপ্রসাদবাবু এক ব্যক্তির সন্ধান করছিলেন যিনি হবেন ভক্তিমান, নিষ্ঠাপূর্ণ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ এবং যিনি তাঁর বৃন্দাবনাগত গৃহদেবী মা কাত্যায়নীর পূজার দায়িত্ব নিতে সক্ষম।

এই সময় রামপ্রসাদবাবু হাওড়ার রামরাজাতলার সুরেন্দ্রনাথ শিরোমণির সংস্পর্শে আসেন। সুরেন্দ্রনাথ শিরোমণির অবস্থা সচ্ছল ছিল না, থাকতেন একটি মাটির ঘরে, পাশে একটি গোশালা, কিন্তু অভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি শাস্ত্রবিধি মেনে পূজার্চনা শুরু করলেন। তাঁর বাড়িতে অনেক আগে থেকেই শারদীয় দুর্গাপূজা হোত। কিন্তু কাত্যায়নী দেবীর আগমনের পর মৃন্ময়ী দুর্গা পূজা বন্ধ হলো। সেই থেকে আজও দুর্গাপূজায় এই পরিবারে কাত্যায়নীরই অবিকল। অত্যন্ত স্নিগ্ধ, সুন্দর মূর্তি, অষ্টধাতুর নির্মিত এবং দু' ফুট উচ্চতাযুক্ত। মহিষাসুর ছাড়া লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ— দেবীর পুত্রকন্যা এবং দেবীর দুই সখী জয়া ও বিজয়া দেবীকে ঘিরে অবস্থান করছেন। এছাড়া বৃন্দাবনের ভাবানুষঙ্গে দেবীর সম্মুখে রাধাকৃষ্ণ বর্তমান।

প্রথমে দেবীকে মাটির ঘরেই রাখা হোত। পরে অংশুপ্রকাশ ভট্টাচার্য দেবীর মন্দির পাকা করে দেন। বর্তমান মন্দির নির্মিত হয়েছে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে। মন্দিরটি অনাড়ম্বর, দালানবাড়ি শ্রেণীর। মন্দিরের সামনে একটু ফাঁকা জায়গা। সেখানে কয়েকটি ফুলের গাছ; এই ফুলেই দেবীর নিত্যপূজা হয়, নিত্য অন্নভোগও দেওয়া হয়। তবে বাৎসরিক পূজা ও উৎসব হয় শারদীয় দুর্গাপূজার সময়। সুরেন্দ্রনাথ শিরোমণির উত্তরপুরুষ, এই বংশের বরিষ্ঠ সদস্য বিভাস চক্রবর্তী জানান— খুব সমারোহের সঙ্গেই দুর্গাপূজার সময় কাত্যায়নীর পূজা হয়। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে দেবীর উদ্দেশে নিবেদিত অন্ন ও লুচির ভোগ প্রসাদ হিসাবে দর্শনার্থী ও ভক্তদের মধ্যে বিতরিত হয়। সাধারণ মানুষ পুষ্পাঞ্জলিও দেয়। সাধারণ মানুষ যেভাবে এই পূজায় অংশ নেয়, তাতে এটি শুধু পারিবারিক পূজা হয়ে থাকে না, পরিবারের গণ্ডি অতিক্রম করে সমগ্র পল্লীর পূজায় পরিণত হয়। ■

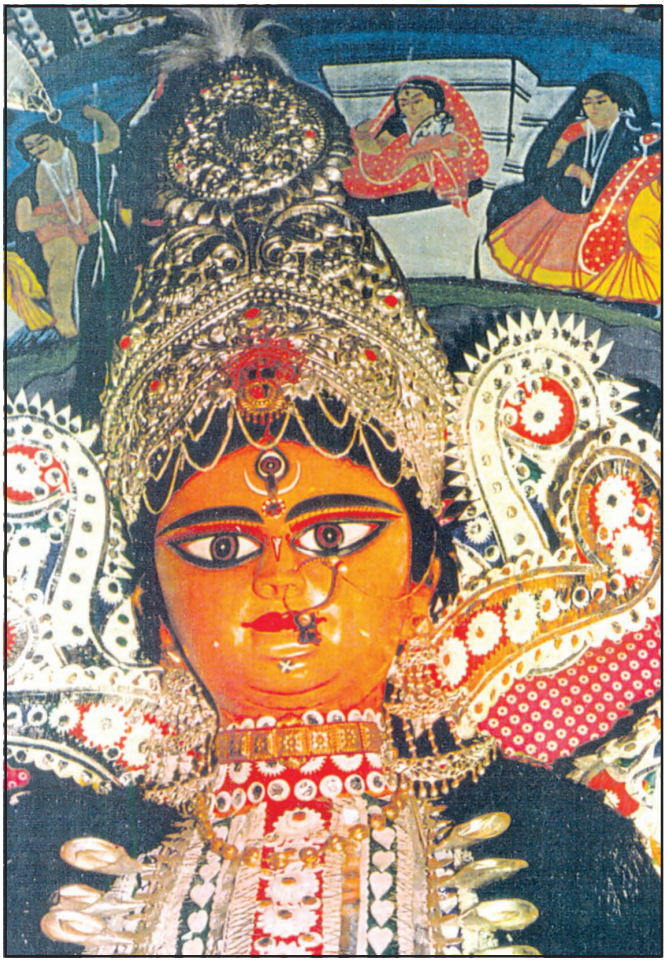

নন্দীবাড়ির দুর্গাপুজো

মুন্সীরহাটের বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজো

শুভাশিস রায়

দেবীপক্ষের সূচনা। এই সময়টার জন্যই বছরভর অপেক্ষা করে থাকা। হাজারো পরিকল্পনা। সঙ্গে চলতে থাকে বাস্তব রূপদানের ব্যস্ততা। দিন আসে দিন যায়, মন থাকে কিন্তু পার্বতীর আরাধনায়। বিশেষ করে রীতিনীতির আড়ম্বরে বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজোয় যার মাত্রা অনেকটাই। ষষ্ঠী থেকে নবমী এক অনন্য অনুভূতির মধ্যে দিয়ে বিরাজ করে মন। কিন্তু দশমী এলেই পরিবেশটা পাল্টে যায়, ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে অন্তর। শুরু হয় বিরহের পালা। বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজোয় দেবী প্রতিমাকে বাড়ির মেয়ে রূপেই দেখা হয়, তাই মেয়ের বিদায়বেলায় মন তো হয়ে উঠবেই ভারক্রান্ত। যেমনটা হয় হাওড়ার নন্দীবাড়ি, মল্লিকবাড়ির পরিবারবৃন্দের।

হাওড়া জেলার প্রাচীন বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজো বললেই সবার প্রথমে উঠে আসে আন্দুল দত্তচৌধুরি জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজো। বংশানুক্রমে যে দালানে পুজোর আয়োজন হয় সেটিও বয়ে বেড়াচ্ছে শতাব্দী প্রাচীন ইতিহাস। সালটা ১৫৭০ খৃস্টাব্দ, এই জমিদার বাড়িতে শুরু হয় দেবীর আরাধনা। ইতিহাসের পাতা যতই ওল্টানো যায় দু-একটা ছাড়া উঠে আসেনি হাওড়ার আর তেমন কোনো প্রাচীন বনেদি পুজোর নাম। এমনই দু-একটা প্রাচীন বনেদি পুজোর অন্যতম নন্দীবাড়ির দুর্গাপুজো। ২৭৩ বছরের পুরনো এই দুর্গাপুজো তাদের ঐতিহ্য বহন করে চললেও যে কোনো কারণেই হোক পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে আসতে পারেনি।

সময়টা মোগল আমলের অন্তিম পর্যায়। দিল্লীর সিংহাসনে আসীন সম্রাট ঔরঙ্গজেবের প্রপৌত্র মোহম্মদ শাহ (১৭১৯-১৭৪৮)। বাংলা, বিহার, ওড়িশার শাসনকর্তা নবাব আলিবর্দি খাঁ। পলাশীর যুদ্ধ তখনও ১৫-১৬ বছর দেরি। তখনও এখানে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হয়নি। হাওড়ার পূর্ব পাড়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সবে জাঁকিয়ে বসেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাক্ মধ্যবর্তী পর্যায়। এই সময়ই শুরু হয় মুন্সীরহাট-এর নবাসন গ্রামের নন্দীবাড়ির দুর্গাপুজো (১১৪৯ বঙ্গাব্দে)।

হাওড়া শহর থেকে সড়কপথে ৩৪ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত জগৎবল্লভপুরের মুন্সীরহাট। মুন্সীরহাটের নবাসন গ্রামেই ইংরাজি বর্ষের ১৭৪১ খৃস্টাব্দে শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে দেবীর আরাধনার শুভারম্ভ। কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ির (১৭৫৭ খৃস্টাব্দ) দুর্গাপুজো শুরু হওয়ার ষোলো বছর আগে শুরু নন্দীবাড়ির দুর্গোৎসব। নন্দীবাড়ির গৃহদেবতা— দামোদর। গৃহদেবতাকে নিয়ে রয়েছে অনেক অজানা কাহিনী। শুধু দুর্গাপুজো নিয়ে বললে, দশপুরুষ ধরে চলে আসছে নবাসনের নন্দীবাড়ির এই দুর্গাপুজো। স্বর্গীয় সন্তোষনারায়ণ নন্দীর হাত ধরে পুজোর শুভারম্ভ মুন্সীরহাটের নন্দীবাড়িতে। নন্দীদের আদি বাসস্থান পূর্ববঙ্গের সুকুন্দেগর, পরবর্তীকালে দেবীপুরে নন্দীরা বসবাস শুরু করেন। পরে সন্তোষনারায়ণ নন্দী মুন্সীরহাটে এসে বসবাস শুরু করলে সেখানেই হয়ে ওঠে নন্দীদের বসতভিটে। নন্দীবাড়ির দুর্গাপ্রতিমা বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মা-য়ের আদলে তৈরি। দেবী বৈষ্ণব মতে পুজো হয়ে থাকেন। আদতে সন্তোষনারায়ণ নন্দী ছিলেন বর্ধমান রাজার গোমস্তা। জানা যায় বর্ধমান রাজার জমিদারির

অন্তর্ভুক্ত ছিল এই নবাসন গ্রাম। পরিবারের সদস্যদের কথায়, সন্তোষনারায়ণ এই জমিদারি দেখভালের জন্য মহারাজার কাছ থেকে পত্তনি নিয়ে নতুন করে নবাসনে বসতি স্থাপন করেন। সেই থেকেই তিনি চালু করেন দুর্গাপুজো।

সর্বমঙ্গলা দেবীর আদলে দুর্গাপ্রতিমা করার কারণ হিসাবে জানা যায়, যেহেতু সন্তোষনারায়ণ রাজপরিবারের জমিদারির অন্তর্গত গ্রামে বসবাস শুরু করেন, সেইমতো সর্বমঙ্গলা মা-য়ের অনুরূপ দেবীমূর্তি পুজো করতে থাকেন। একচালার প্রতিমা, মায়ের নাকে থাকে বৈষ্ণব তিলক। দেবীমূর্তির ডানদিকে উপরে গণেশ এবং বাঁদিকের উপরে কার্তিক। এই দেবীর অবস্থান একটু পৃথক। গণেশ এবং কার্তিকের নিচে অবস্থান করতে দেখা যায় লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে। সঙ্গে থাকে জয়া এবং বিজয়া নামের দুই সখি। একচালার এই প্রতিমার সারা শরীর নানান অলঙ্কারে সজ্জিত থাকে। এমনকী দেবীর অস্ত্রেও রয়েছে নানান বৈচিত্র্য। মূলত উল্টোরথের পর শয়ন একাদশীতে নন্দীবাড়ির এই প্রাচীন দুর্গার কাঠামো পুজো হয়। দেবীমূর্তি গড়ে তোলার জন্য বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় রবিবার মোট ১২ ঝুড়ি মাটি তোলার রীতি আছে যা দিয়ে পরে গড়ে তোলা হয় দেবীমূর্তি।

নন্দীবাড়ির পুজোতে কুমারীপুজোর কোনো রীতি নেই। প্রকৃত কারণ কিন্তু কারোরই জানা নেই। আদি অনন্তকাল ধরে এটাই চলে আসছে। বাড়ির দীক্ষিত ব্যক্তিই কলাবউ স্নান করাবেন, এটাই রীতি। বৈষ্ণব মতে পূজিত হন দেবী। তাই সপ্তমী, অষ্টমী, সন্ধিপুজো এবং নবমীতে চালু আছে বলিপ্রথা। তবে কোনো পশুবলি দেওয়া হয় না। তিনদিনই চালকুমড়ো, আখ, আদা, হলুদ, বাতাবিলেবু বলি দেওয়া হয়।

পুজোর নৈবেদ্যতে ষষ্ঠী থেকে নবমী প্রতিদিন গড়ে তিন মণ চালের নৈবেদ্য তৈরি হয়। নিজস্ব চণ্ডীমণ্ডপেই বংশপরম্পরায় পুজো হয়ে আসছে নন্দীবাড়ির। দু'জন ব্রাহ্মণের দ্বারাই পূজিত হন মহিষাসুরমর্দিনী। পুজোয় ১৬ রূপ চণ্ডীপাঠ হয়। ষষ্ঠী থেকে নবমী দক্ষিণান্ত পর্যন্ত হোমকুণ্ড জ্বলতে থাকে। বাঁশের দোলাতেই হয় মায়ের নিরঞ্জন। কয়েক দশক আগে পর্যন্ত দশমীর বিসর্জনের পর লাঠি খেলার চল ছিল এই বাড়িতে। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা আজ বন্ধ হয়ে গেছে। পুজোর ব্যয়নির্বাহ দেবোত্তর সম্পত্তির আয় থেকেই হয়ে থাকে। এরজন্য যথেষ্ট পরিমাণ দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দিষ্ট করা আছে। ১৬ বিঘা দীঘি এবং ৫টি পুকুর থেকে যা আয় হয় তা দিয়েই বহন করা হয় পুজোর যাবতীয় খরচ।

নন্দীবাড়ি ছাড়া মুন্সিরহাটের আরও একটি প্রাচীন পুজো খড়দহ ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামের মল্লিকবাড়ির পুজো। এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কয়েক দশকের ইতিহাস। যদিও কবে থেকে এই পুজোর সূচনা তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের দাবি এটি বহু প্রাচীন পুজো। স্বর্গীয় নন্দলাল মল্লিকের আদি বাড়ি জাঙ্গিপাড়ার বাহিরঘড়া গ্রামে। বাহিরঘড়া গ্রামের দুর্গাপুজো আরো প্রাচীন। নন্দলাল মল্লিক বাহিরঘড়া থেকে মুন্সীরহাটে এসে পাকাপাকি বসবাস শুরু করলে এখানেও চালু করেন দেবীর আরাধনা। নন্দীবাড়ির গৃহদেবতা যেমন দামোদর তেমনই মল্লিকদের শ্রীধর। তার নামেই পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছে এস্টেট।

পুজো পরিচালনার দায়িত্বে শ্রীশ্রী শ্রীধর জীউ এস্টেট। ১৯৫০ সালে প্রথম রেজিস্ট্রি হয় এই পুজো। তারপর থেকে এস্টেটের পরিচালনায় হয়ে আসছে এই দুর্গোৎসব। একচালের এই প্রতিমা ডাকের সাজে সজ্জিত থাকেন। কিন্তু মহিষবিহীন এই একচালার প্রতিমা নানান অলঙ্কারে আর পিতলের অস্ত্রে সজ্জিত। ষষ্ঠী থেকে পুজো শুরু হয়। কথিত আছে পূর্বে মল্লিকবাড়ির সদস্যরা পায়ে হেঁটে কাঁধে করে গঙ্গাজল এনে পুজো শুরু করতেন। কিন্তু বর্তমানে সময়ের সঙ্গে তার কিছুটা পরিবর্তন লক্ষণীয়। পুজোর তিনদিনই অর্থাৎ সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত পাঁঠাবলি হয়ে থাকে। নবমীতে আখ, আদা, বাতাবিলেবু, চালকুমড়োও বলি হয়। অষ্টমী-নবমীতে ধুনো পোড়ানোর চল আছে। আবার এই পুজোয় গ্রামবাসীদের অনেককেই মানত করে দণ্ডি কাটতেও দেখা যায়। সপ্তমীর দিন নবপত্রিকা স্নান করানো হয়। মল্লিক বাড়ির নৈবেদ্য সত্যিই দেখার মতো। সপ্তমীতে একমণ চালের নৈবেদ্য হয়। অষ্টমীতে শুধুমাত্র একটি থালাতেই একমণ চালের একটি নৈবেদ্য হয়ে থাকে। এই দিনই বাকি আরও একমণ চালের বেশ কয়েকটি নৈবেদ্য তৈরি হয়, নবমীতেও তাই। পুজোর তিনদিন লুচি ভোগের সঙ্গে থাকে দশমীতে খিচুড়ি ভোগের আয়োজন। মল্লিক বাড়ির সুপ্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপেও রয়েছে নানান বৈচিত্র্য। এই বাড়ির পুজোয় তিন রূপে চণ্ডীপাঠ হয়। তবে জোগাড়ের দায়িত্বে থাকেন মূলত পুরুষরাই। জোগাড়ে মহিলাদের থাকার রীতি নেই এই বাড়ির পুজোয়। প্রতিদিন ৪২টি করে নৈবেদ্যর জোগাড় করে বাড়ির ছেলেরাই। কথিত আছে, এই মাতৃ-আরাধনায় যদি কোনো ত্রুটি হয় তাহলে তার প্রমাণস্বরূপ পরিবারের কোনো মহিলার ভর হওয়ার ঘটনা ঘটে। সেখানেই প্রকাশ পায় নানান ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা।

এরপরই আসে সেই ভারাক্রান্ত দিন। নিরঞ্জনের পথে মা এগিয়ে চলেন। সেই সঙ্গে শুরু হয় আরো একবছরের প্রতীক্ষা।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি কপি ১০ টাকা।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

টাকার আপদ

সুকুমার রায়

বুড়ো মুচি রাতদিনই কাজ করছে আর গুনগুন গান করছে। তার মেজাজ বড় খুশি, স্বাস্থ্যও খুব ভালো। খেটে খায়। স্বচ্ছন্দে দিন চলে যায়।

তার বাড়ির ধারে এক ধনী বেনে থাকে। বিস্তর বাড়ি তার। মস্ত বাড়ি, অনেক চাকরবাকর। মনে কিন্তু তার সুখ নাই। স্বাস্থ্যও তার ভালো নয়। মুচির বাড়ির সামনে দিয়ে সে রোজ যাতায়াত করে আর ভাবে, 'এ লোকটা এত গরিব হয়েও রাতদিনই আনন্দে গান করছে। আর আমার এত টাকাকড়ি, আমার একটুও আনন্দ হয় না মনে। গাওয়া তো দূরের কথা, ইচ্ছা হলে তো টাকা দিয়ে রাজ্যের বড়-বড় ওস্তাদ আনিয়ে বাড়িতে গাওয়াতে পারি। নিজেও গাইতে পারি। কিন্তু সে ইচ্ছা হয় কই?' শেষটায় একদিন সে মনে মনে ঠিক করল সে এবার যখন মুচির বাড়ির সামনে দিয়ে যাবে তখন তার সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা বলবে।

পরদিন সকালেই সে গিয়ে মুচিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হে মুচি ভায়া, বড় যে ফুর্তিতে গান কর, বছরে কত রোজগার করো তুমি?'

মুচি বলল, 'সত্যি বলছি মশাই, সেটা আমি কখনও হিসেব করিনি। আমার কাজেরও কোনোদিন অভাব হয়নি, খাওয়াপরাও বেশ চলে যাচ্ছে। কাজেই, টাকার কোনো হিসেব রাখবারও দরকার

হয়নি কোনোদিন।'

বেনে বলল, 'আচ্ছা, প্রতিদিন কত কাজ করতে পারো তুমি?'

মুচি বলল, 'তারও কিছু ঠিক নেই। কখনো বেশি করি। কখনো কম করি।'

মুচির সাদাসিধে কথাবার্তায় বেনে বড় খুশি হলো। তারপর একটা টাকার থলে নিয়ে সে মুচিকে বলল, 'এই নাও হে— তোমাকে এই একশো টাকা দিলাম। এটা রেখে দাও। বিপদ-আপদ, অসুখ বিসুখের সময় কাজে লাগবে।'

মুচির তো ভারি আনন্দ। সে সেই টাকার থলেটা নিয়ে মাটির তলায় লুকিয়ে রেখে দিল। তার জীবনে সে কখনো একসঙ্গে এতগুলি টাকা চোখে দেখেনি।

কিন্তু আস্তে আস্তে তার ভাবনা আরম্ভ হলো। দিনের বেলা বেশ ছিল। রাত্তির হতেই তার মনে হতে লাগল, 'ওই বুঝি চোর আসছে।' বেড়ালে ম্যাও করতেই সে মনে করল, 'ওই রে! আমার টাকা নিতে এসেছে।'

শেষটায় তার আর সহ্য হলো না। টাকার থলিটা নিয়ে সে ছুট্টে বেনের বাড়ি গিয়ে বলল, 'এই রইল তোমার টাকা। এর চেয়ে আমার গান আর ঘুম ঢের ভালো।'

সংকলন : কৌশিক গুহ
ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

রঙ ভরো

প্রশ্নবাণ

১. ভারতে কতজন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন? প্রথম কে ছিলেন? এখন কে?
২. প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় কে কে মারা গেছেন?
৩. কার্যনির্বাহী অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী কে হয়েছিলেন? কবার?
৪. কোন প্রধানমন্ত্রী দেশের সর্বোচ্চ সম্মান প্রথম পান? কবে?
৫. অটলবিহারী বাজপেয়ী ক'বার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন? রাজনীতির আগে তিনি কি করতেন?

উত্তর : ১. পনেরোজন। জওহরলাল নেহরু। নরেন্দ্র মোদী। ২. জওহরলাল নেহরু। লালবাহাদুর শাস্ত্রী। ইন্দিরা গান্ধী। ৩. গুলজারিলাল নন্দ। দু'বার। ৪. জওহরলাল নেহরু। ১৯৫৫। ৫. তিনবার। সাংবাদিকতা।

ছবিতে তফাত খোঁজ

এসো আবার পড়ি

গাঁয়ের পূজা

কালিদাস রায়

ঘণ্টা বাজায় পুরুত ঠাকুর, কাঁসর বাজায় কানাই।
মা-লক্ষ্মীরা শঙ্খ বাজায়, মুচিরা ঢোল সানাই।
পুরুত বসে বেদীর পাশে, মুচিরা আটচালায়।
দাওয়ায় বসে নাপিত বেচু গুগগুলু ধূপ জ্বালায়।

চাষীরা নৈবেদ্য যোগায়, বাগদিরা গায় কবি,
মালী যোগায় বেলপাতা-ফুল, গয়লা হোমের হবি।
সোলার সাজে সাজায় মায়ের ডাকের কারিগর।
ঘটের সাথে পটের শোভায় পূজার আড়ম্বর—
এই তো হলো চিরকালের সর্বজনীন পূজা,
দশের পূজা দশ হাতে নেন তাই মা দশভুজা।।

মায়ের ডাকেই সকল ছেলের সব ব্যবধান হরে।
পূজা মায়ের সারা গাঁয়ের, হোক না একের ঘরে।।

মায়ের দুধ ও দুধের ব্যাঙ্ক

শুভশ্রী দাস

মায়ের দুধকে অমৃত বলা হয়। নিয়ম মেনে শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ পান করালে শিশু জীবনযুদ্ধে অনায়াসে জয়লাভ করতে পারে। অর্থাৎ শিশুর শরীরে রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। মায়ের দুধে অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। শিশুর মস্তিকের বিকাশের জন্য আবশ্যক ওমোগা থ্রি অ্যাসিড ও কোলেস্ট্রালের প্রয়োজন হয়, তা মায়ের দুধেই পাওয়া যায়। শিশুর কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ল্যাকটোজ ও গ্যালেকটোজ নামে শর্করাও এর মধ্যে থাকে। ভিটামিন এ, ডি, ই, সি এবং ক্ষার প্রয়োজন মাত্রায় থাকে। মায়ের দুধ পানকারী শিশুকে জলপান করানোর প্রয়োজন হয় না। মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে শিশু আর একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস পায় তা হলো এনার্জি ও গৃহপালিত পশুপাখির থেকে সুরক্ষা। শিশুর জন্মের পরেই মাতৃস্তন্য থেকে ঘন হলুদ তরল নির্গত হয়, তাকে কোলোস্ট্রাম বলা হয়। এর মধ্যে জীবনদায়ী অনেক উপাদান থাকে।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুকে মায়ের কাছে আনা হয়। মায়ের স্পর্শ পেতেই শিশু কোলোস্ট্রাম নেওয়ার চেষ্টা করে। শিশুর মুখের স্পর্শ পেতেই মায়ের দুধ আপনা হতেই ক্ষরণ হতে শুরু করে। প্রথমদিনে শিশু এক বা দেড় চামচ দুধ পান করে কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে ৩০ থেকে ৬০ মিলিলিটার দুধপান করতে শুরু করে। নবজাত শিশু দিনে ৮ থেকে ১২ বার দুধ পান করতে পারে। এই সময় মাকে নিজের স্বাস্থ্য সম্পকে সচেতন থাকতে হবে। এই সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সংযম পালন করা। মায়ের চিন্তা-ভাবনা সবই দুধের সঙ্গেই শিশু গ্রহণ করে।

ইদানীংকালে আমাদের দেশের মায়েরা শিশুকে স্তন্যপান করানোর ব্যাপারে খুবই অনভিজ্ঞ হয়ে পড়েছেন। এজন্য সারা দেশে স্তন্যপান নিয়ে সচেতনতা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। স্তন্যপান নিয়ে ভুল ধারণাগুলো বদ্ধমূল হয়ে বসেছিল। যেমন, প্রাণদায়ী কোলোস্ট্রাম শিশুকে পান না করিয়ে জলে ফেলে দেওয়া। যার ফলে শিশুর রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতা কমে যেত। ফলে শিশুমৃত্যুর হারও বাড়তে থাকে। আধুনিকতার নাম দিয়ে অনেক মা-ই টানা ছ'মাস শিশুকে স্তন্যপান করাতেন না। ২০০৩ সালের একটি পরিসংখ্যানে জানা

যায়, ভারতে একটানা শুধু স্তন্যপান করাতেন মাত্র ২০ শতাংশ মা। এ কারণে অপুষ্টিজনিত রোগে ০-৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুমৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ৯৫।

সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার, শিশুকে স্তন্যপান করানোর সঠিক পদ্ধতিই জানেন না আমাদের পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক মায়েরা— এমনটাই একটি সমীক্ষায় ওঠে এসেছে। মজার বিষয় হলো— এ বিষয়ে গ্রামের থেকে শহরের মায়েরাই বেশি অনভিজ্ঞ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন— স্তন্যদুগ্ধ শিশুর শরীরে ন্যাচারাল কিলার সেল বাড়িয়ে দেয়। ফলে ক্যানসারের আশঙ্কা কমে। ডায়াবিটিস, ওবেসিটি, হাইবিপি, হাই লিপিডোপিয়ার প্রবণতা কমে। শিশুর ড্রিহাইড্রেশন, ম্যালনিউট্রিশনের সম্ভাবনা কমে। স্তন্যপান করানোর ফলে মায়ের লাভ হয়— ব্রেস্ট ক্যানসারের সম্ভাবনা কমে, পোস্ট পার্টাম ব্লিডিং তাড়াতাড়ি কমে, গর্ভাশয় খুব তাড়াতাড়ি পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে এবং স্তন্যপান করানোর সময় ফার্টিলিটির সম্ভাবনা কম থাকে।

কিন্তু অনেক কারণে কোনো কোনো মা তাঁর শিশুকে স্তন্যপান করাতে পারেন না। এক্ষেত্রে সেই শিশুদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে 'হিউম্যান মিল্ক ব্যাঙ্ক' অর্থাৎ মায়ের দুধের ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়েছে। মুম্বয়ের ডাঃ আরমিডা ফার্নান্ডেজ এরকম হতভাগ্য শিশুদের কথা ভেবে ১৯৮৯ সালে এশিয়ার প্রথম 'হিউম্যান মিল্ক ব্যাঙ্ক' শুরু করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি 'সিনিয়র কমনওয়েলথ ফেলোশিপ' ছাত্রবৃত্তির জন্য লন্ডন গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি মাতৃদুগ্ধ ব্যাঙ্কের ধারণা পান।

ডাঃ আরমিডার পরিকল্পনা ভারতের সব রাজ্যই গ্রহণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের এস এস কে এস হাসপাতালের 'ব্রেস্ট মিল্ক ব্যাঙ্ক' গত বছর শুরু হয়েছে। এক বছরে 'ব্রেস্ট মিল্ক ব্যাঙ্ক'-এ প্রায় দু' হাজার মায়েরা ৮৫০ লিটার দুধ দান করেছেন। একটি গবেষণায় জানা যাচ্ছে— স্তন্যপান না করালে শিশুর বুদ্ধি একেবারেই কমে যায়। দেশে বুদ্ধিহীন মানুষের সংখ্যা যাতে আর না বাড়ে সেজন্য মায়েরা এখন সচেতনভাবে শিশুকে স্তন্যপান করাচ্ছেন। আর মায়ের দুধ না পাওয়া শিশুদের জন্য 'মাতৃদুগ্ধ ব্যাঙ্ক'ও প্রচারের আলোয় এসে গেছে। এস এস কে এস হাসপাতালের নিওন্যাটোলজিস্ট ডাক্তারবাবুর কথায় --- ''আমাদের হাসপাতালে স্তন্যদানে অসমর্থ মায়ের নবজাত শিশুদের সবাইকে আমরা 'মাতৃদুগ্ধ ব্যাঙ্ক' থেকে দুধ দিচ্ছি। এটা ওদের নবজীবন দান করছে।" ■

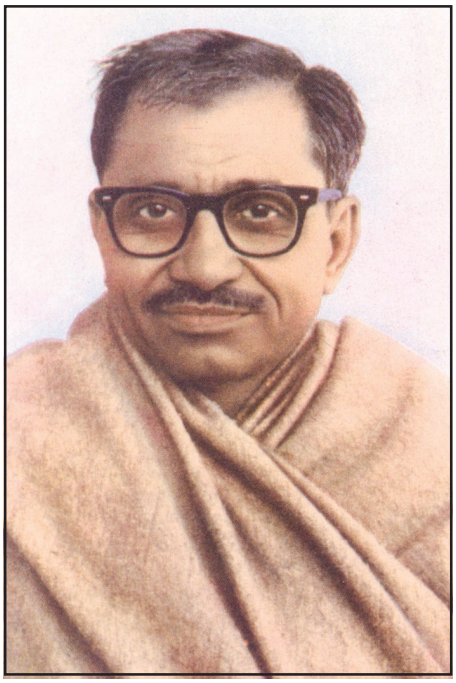

একাত্ম মানবদর্শন ও ভারতের আর্থিক বিকাশ

সুতপা ভড়

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ সমগ্র বিশ্বকে জীবনপথে চলার সঠিক পথ দেখিয়েছে। আমাদের ঋষি-মুনিরা নিজেদের, সমাজের, দেশের তথা সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলকামনায় ব্রতী ছিলেন। তাঁরা দিয়েছেন আমাদের মহামন্ত্র— 'বিশ্বম্ ভবতু এক নীড়ম্' এবং 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। নিজেদের জীবনে তাঁরা প্রমাণ করেছেন এই মন্ত্র দুটির সত্যতা এবং নিত্যতা। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এই পথেরই পথিক। আধুনিক মননশীলতা এবং প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারাকে একাত্ম করে তিনি আমাদের দিয়েছেন 'একাত্ম মানবদর্শন'--- আধুনিক ভারতবর্ষের জন্য এক প্রত্যয়ী নির্দেশ। দীনদয়ালজী মানুষের ব্যক্তিত্বের চারটি বিশেষ দিক— শরীর, মন, বুদ্ধি এবং আত্মার সঙ্গে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং সৃষ্টির মধ্যে যে অন্তর্সম্বন্ধ রয়েছে তার আলোচনা করেছেন। তিনি আমাদের এক নতুন আর্থিক বিকাশের পথ দেখিয়েছেন যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং সৃষ্টির সঙ্গে বাইরের সম্পর্কের কোনো সংঘাত সৃষ্টি করেনি। তাঁর ভাবনায় আর্থিক বিকাশের তিনটি উদ্দেশ্য— প্রথমত, আমাদের আর্থিক যোজনাগুলির দ্বারা রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সামর্থ্য উৎপন্ন করা। দ্বিতীয়ত, এই আর্থিক বিকাশ গণতন্ত্র রক্ষার পথে কখনও বাধা হবে না এবং তৃতীয়ত, আমাদের জীবনের সাংস্কৃতিক মূল্য যা রাষ্ট্রীয় জীবনের দিশা নির্দেশ করে এবং সমগ্র বিশ্ব আজ যাকে সাদরে গ্রহণ করে মর্যাদা দিয়েছে, সেই সাংস্কৃতিক মূল্যগুলিকে রক্ষা করে আর্থিক বিকাশের পথ সুদৃঢ় করা।

অনাদিকাল থেকে জগৎ কল্যাণের জন্য আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রাণাতিপাত করেছেন। নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা, তাৎক্ষণিক সুখের থেকে অনেক উঁচুতে তাঁরা নিজেদের তুলে ধরেছিলেন। তাঁদের জীবনের লক্ষ্য ছিল মোক্ষপ্রাপ্তি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাণী--- 'মা ফলেষু কদাচন'— তাঁরা তাঁদের জীবনে প্রয়োগ করেছেন। ব্যক্তির উপর পরিবার— তার ওপর সমাজ এবং তারপর দেশ তথা সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য তাঁরা অবিরাম কর্ম করে গেছেন। ফলের আশা না করে মানুষ যখন কাজ করে, তখন তা সমগ্র সমাজ তথা বিশ্বের জন্য মঙ্গলদায়ী হয়। এই পথের পথিক ছিলেন মহাবীর পৃথু, তারপর মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরাম। নিষ্কাম কর্মযোগী হনুমানজীর থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে আরও কতও মহাপুরুষ এখানে পদচিহ্ন রেখে গেছেন তাঁদের সবার নাম আমরা আমাদের অজ্ঞানতার জন্য জানি না। এই নিষ্কাম কর্মযোগের প্রতিফলন দীনদয়ালজীর একাত্ম মানবদর্শনের মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

একবার দৈত্যদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ধরিত্রীমাতা গাভীর রূপ ধারণ করে পালাবার চেষ্টা করেন। স্বয়ং নারায়ণ তখন রাজা পৃথুর রূপ নিয়ে মা বসুন্ধরাকে দৈত্যদের শোষণ এবং অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন। কৃতজ্ঞ মাতা বসুন্ধরা নিজের নাম গ্রহণ করলেন পৃথিবী (পৃথুর কন্যা)। পৃথুর নির্দেশ আমাদের পূর্বপুরুষরা পালন করেছেন এবং এখন এসেছে আমাদের সেই উত্তর দায়িত্ব পালন করার সময়।

একথা সত্যি যে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সতর্কবাণী সম্পূর্ণভাবে পালন করিনি। প্রাচীনকালের নির্দেশানুযায়ী চললে আজ আমরা এই অবক্ষয়ের মুখোমুখি হতাম না। উর্বর জমিতে অত্যধিক রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করে বিজ্ঞানের উন্নতির নামে পৃথিবীকে দূষিত করে চলেছি। জৈবিক সারের প্রয়োগ আমাদের পূর্বপুরুষরা শিখিয়েছেন, তা কি আমরা ভুলে গেছি? দীনদয়ালজীর মতানুসার উৎপাদন প্রক্রিয়া তখনই সার্থক হবে যখন তা পারস্পরিক পরিপূরক হবে। ফলস্বরূপ আমরা পৃথিবীমাতার থেকে আমাদের প্রয়োজন অনুসারে যা চাই তা পেতে থাকব।

এখন প্রশ্ন উঠছে, দীনদয়ালজী আর্থিক বিকাশ বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন? পাশ্চাত্যের আর্থিক বিকাশ বিনাশশীল। দৈনন্দিন ভোগবাদী জীবনযাত্রার পেছনে আমরা যে ছুটে চলেছি এ কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির আর্থিক বিকাশের পথ নয়! স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও যদি ফিরে দেখি, দেখব যে অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান— এই ছিল আমাদের প্রাথমিক প্রয়োজন। কিন্তু পাশ্চাত্যের বৈশ্বিক ভাবনা অর্থাৎ

ভোগবাদ আমাদের বিশেষ করে যুবপ্রজন্মকে প্রলোভিত করেছে। তারা বিনাশরূপী আগুনের দিকে কীটপতঙ্গের মতো ছুটে চলেছে— যা আমাদের সর্বস্বান্ত করে দেবে। এসময় তাদের সঠিক দিশা দেখাবার জন্য আবার আমাদের পূর্বপুরুষদের শরণাগত হওয়া আশু কর্তব্য।

দীনদয়ালজী প্রকৃতির ভারসাম্য সর্বোপরি বজায় রেখে আর্থিক বিকাশের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর মতানুসার প্রাকৃতিক সামগ্রীর ব্যবহার এমনভাবে করা উচিত যাতে প্রাকৃতিক পদার্থের যথার্থ প্রয়োগ হয় অর্থাৎ ন্যূনতম প্রাকৃতিক সম্পদ প্রয়োগ করে অধিকতম ফল লাভ করা। প্রকৃতিকে রক্ষা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। অগ্নিপুরাণে আছে, ঘরের দক্ষিণে আম, উত্তরে পাকুড়, পূর্বে বট এবং পশ্চিমে অশ্বত্থ বৃক্ষ কল্যাণকারী। মহাভারত আমাদের সাবধান করে নির্দেশ দিয়েছে, যে মানুষ গাছ কাটে এবং নদ-নদী প্রদূষণ করে, সে আত্মহত্যার পাপে পাপী হয়।

শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দীনদয়ালজী সমাজের ওপর ন্যস্ত করেছেন। আমাদের সমাজ তথা দেশের পূর্ণ দায়িত্ব হলো আজকের শিশুদের সুশিক্ষা এবং সু-সংস্কার দেওয়া। কারণ এই শিশুদের শিক্ষার ওপরই নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ এবং তার বিকাশ।

আর্থিক বিকাশের জন্য পুঁজি আবশ্যক। দীনদয়ালজীর মতে পাশ্চাত্যের অনুসরণ করে ধার বা ঋণ করে পুঁজি সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয় নয়। আমরা ওই ঋণ নেওয়া পুঁজি সুদ সমেত ফেরত দেওয়ার জাঁতাকলে যেন না পড়ি--- এ ব্যাপারে তিনি সাবধান করেছেন। আমাদের দেশের পরম্পরা হলো Simple living high thinking। আমরা সংযমী এবং সাধাসিধে জীবনযাপন করে যে অর্থ সঞ্চয় করি তাকে পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ এতে পুঁজি এবং তার ঋণ আমাদের ওপর চড়বে না। স্বাধীন ব্যবসা হবে সমাজের আর্থিক উন্নতির সহায়ক। আধুনিক ভারতবর্ষ প্রযুক্তির বলে বলীয়ান। বিজ্ঞানের দান প্রযুক্তি। আমাদের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধ বজায় রেখে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি আর্থিক বিকাশের সার্থক সহযোগিতা করে চলেছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্বর্গীয় লালবাহাদুর শাস্ত্রীর উক্তি— 'জয় জওয়ান, জয় কিষাণ'-এর সঙ্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী খুবই প্রাসঙ্গিকভাবে যুক্ত করেন 'জয় বিজ্ঞান'।

ভারতীয় জীবনযাত্রা ও মূল্যবোধে চতুরাশ্রমের প্রভাব অনস্বীকার্য। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে 'ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ', গৃহস্থাশ্রমে সংযমী হয়ে সংসারধর্ম পালন করা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য অনুকূল পরিবেশ রচনা করে বানপ্রস্থ নেওয়ার উপদেশ ঋষি-মুনিরা দিয়েছেন। বানপ্রস্থে সামাজিক উন্নয়নে আত্মনিবেদন কাম্য। সর্বশেষে সন্ন্যাস অর্থাৎ সংসারের মোহ ত্যাগ করে তপস্বী জীবনযাপন করা, প্রকৃতির প্রতি যত্নবান হওয়া এবং মোক্ষ তথা ঈশ্বরলাভের চেষ্টা করা--- এই দিশা নির্দেশ আছে আমাদের জন্য। ভোগ নয়, ত্যাগই আমাদের জীবনের পরম সত্য। এই পরম সত্যকেই আমাদের সমগ্র আর্থিক বিকাশের এক অন্যতম প্রধান সহায়ক মেনেছেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়।

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় বলেছেন, আমরা সামাজিক প্রাণী। সমাজ দেশ এবং সমষ্টির অঙ্গমাত্র। এদের রক্ষা এবং অগ্রগতির দায়িত্ব আমাদের হাতেই আছে। আমাদের কর্তব্য হলো এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাতে আমাদের দেশের সমস্ত নাগরিক ন্যূনতম জীবনশৈলী (মূল্যবোধগুলি) অনুসরণ করতে পারে। এরপর আমাদের উদ্দেশ্য আর্থিক উন্নতির গতি প্রবাহমান রাখা। সাধাসিধে জীবনযাপন করে উচ্চ লক্ষ্য নিয়ে যে সমাজ পথ চলা শুরু করে, সেই সমাজ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পুঁজি এবং নিজস্ব সংস্কৃতির ওপর নির্ভর করে এক শক্তিশালী সমৃদ্ধ সমাজ এবং রাষ্ট্র নির্মাণ করতে সক্ষম। এর ফলস্বরূপ আর্থিক বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে শিক্ষা, সংস্কারের ওপর নির্ভর করে আমরা যে আর্থিক বিকাশের পথে চলেছি, সেই পথের দিশারি হলেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়। এই পথ অসীম, অনন্ত।

তথ্যসূত্র :

১। সীতা রামায়ণ— দেবদত্ত পট্টনায়ক।

২। মহাভারত।

৩। অগ্নিপুরাণ।

৪। 'একাত্ম মানববাদ' প্রয়োগ করে সাফল্যের সঙ্গে পালামপুর, হিমাচল প্রদেশে গবেষণা করে চলেছেন ড. রাসবিহারী ভড়। তাঁর অনুপ্রেরণা অনস্বীকার্য।

৫। একাত্ম মানববাদ— পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়।

।। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মদিবস স্মরণে।।

‘আচ্ছে দিন’ এসে গেছে, বিরোধীরা চোখে পট্টি বেঁধেছে

দেবব্রত চৌধুরী

গত ৮ সেপ্টেম্বর ইংরেজি স্টেটসম্যান পত্রিকা প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ার খবর অনুযায়ী লিখেছে--- ‘সারা বিশ্বের উন্নতকামী দেশের দিকে এগিয়ে চলেছে ভারত, এমনকী সারা বিশ্বে ভারতের প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা গত ১০০ দিনের মধ্যে বিপুলভাবে বেড়ে গেছে’। পত্রিকা আরও লিখেছে--- স্বজন পোষণ ও বিশেষ সংস্থাগুলিকে খাতির করা (?)-র ব্যাপারে ভারতের স্থান ছিল ১৯৩ নম্বরে। গত কয়েক মাসের মধ্যে ভারত উঠে এসেছে ৪৯ স্থানে। মাঝে ১৪৯ ধাপ এগিয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতায় বা আস্থায় ভারত ছিল গত বৎসর পর্যন্ত ১১৫নং স্থানে, এখন ভারতের স্থান হয়েছে ৫০ নম্বরে। এগোতে পেরেছে ৬৫ ধাপ।

দুর্নীতিতে ভারত গত বৎসর পর্যন্ত ছিল ৯৩নং স্থানে। চোখ ধাঁধানো উন্নতি করে ভারত এখন অবধি এসেছে ৫০ নম্বর স্থানে এবং উন্নতির ধারা এগিয়েই চলেছে সর্বক্ষেত্রে, কিন্তু কংগ্রেস-বামফ্রন্ট ও তৃণমূলীদের এসব নজর পড়ছে না।

গত ১৫ আগস্ট লালকেল্লায় মোদীজী বললেন, যোজনা কমিশন তিনি তুলে দিচ্ছেন। পরিবর্তে স্থানীয় প্রয়োজনভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কমিশন বসাতে চাইছেন। ২০১২ সাল পর্যন্ত ভারতে ১১টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হয়ে গেছে। তাই প্রশ্ন উঠেছে, ৬০ বৎসর ধরে এই কমিশন কি করছে, কি উন্নতি হয়েছে দেশের। রিপোর্ট অনুযায়ী পৃথিবীর ১৭ শতাংশ মানুষ ভারতে থাকে এবং বিশ্বের গরিব

মানুষের ২২ শতাংশ হচ্ছে ভারতের অধিবাসী। এই কমিশনের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান মান্টেক সিং আলুওয়ালিয়ার অফিসে ‘টয়লেট’ সাজাতে লেগেছে ৩৫ লক্ষ টাকা এবং এই অফিসে বসে কমিশন বলছে ভারতে গ্রামে দৈনিক মাত্র ২২ টাকা ও শহরে ২৮ টাকায় একটি মানুষের দিন চলতে পারে। রাজীব গান্ধীর আমলে এই কমিশনে তৎকালীন অধিকর্তা এবং পরবর্তীকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-কে ‘জোকার’ বলে উপহাস করেছিলেন। মোদীজী বিশ্বাসযোগ্যতাহীন এই কমিশনটিই বিলোপ করে দিয়ে দেশের বিপুল অর্থ ব্যয় করা থেকে বাঁচালেন।

৯ আগস্ট নেহরু স্টেডিয়ামে বিজেপি কার্যসমিতির বৈঠকে মোদীজী বললেন, ডব্লুউ টি ও চুক্তিতে ভারত আর কোনো সই করবে না। ডব্লুউ টি ও চুক্তিতে ভারত সই করেছিল নরসিংহ রাওয়ের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন। মোদীজীর মতে এই চুক্তিতে আমেরিকার চাষির স্বার্থ রক্ষার জন্য করা হয়েছিল। প্রমাণ স্বরূপ একটি উদাহরণ দেওয়া যায়— ডব্লুউ টি ও চুক্তির আগে ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে কৃষিজাত দ্রব্য আমেরিকা থেকে আমাদের দেশে আমদানি হয়েছিল যার মূল্য ছিল ৪২৩৮৯ মিলিয়ন ডলার। চুক্তিটি সইয়ের পর ২০০১-২০০২ সালে আমেরিকা কৃষিজাত দ্রব্য ভারতে রপ্তানি করল ৫০৫৩৮ মিলিয়ন ডলার, প্রায় ৮১৪৩ মিলিয়ন ডলার মূল্যের কৃষিজাত দ্রব্য। এভাবেই ভারতীয় চাষিদের বাজার দখল করল। এই দখলদারি বেড়েই চলেছে। ভারতে প্রতি বৎসর বাজার বেদখল হওয়ার জন্য কৃষকরা কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য পাচ্ছে না, প্রতি বৎসর কৃষক আত্মহত্যা করছে— বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এ ব্যবস্থা মেনে নিতে পারেননি। তাই ডব্লুউ টি ও চুক্তি বাতিল করলেন। কি অন্যায় করেছেন? —মোদীজী সদস্যদের জিজ্ঞাসা করলেন।

মোদীজী প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলিতে ৪৯

শতাংশ এফ ডি আই-এর ঘোষণা করলেন। সব দল 'গেল-গেল' বলে 'সব শেয়ালের এক রা'র মতো চেঁচিয়ে উঠল। মোদীজী বললেন— আমাদের প্রতিবেশী পাকিস্তান ও ভারত বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করে। এই অস্ত্র প্রস্তুতকারক একটাই দেশ আমেরিকা অথচ আমাদের অস্ত্র প্রস্তুতকারক প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলি ধুঁকছে। ভারতের প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলির উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের তৈরি অস্ত্রে 'প্যাটন ট্যাঙ্ক' ধ্বংস করে পৃথিবী অস্ত্র প্রস্তুতকারক দেশগুলিকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। আমাদের দেশে জব্বলপুরে তৈরি 'শক্তিমান' মিলিটারি গাড়ি সারা বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করেছিল। আজ সেই সব সংস্থা প্রায় বন্ধ নয়তো সরকার বিক্রি করার পরিকল্পনা নিয়েছে। মোদীজী বলেছেন— 'যাঁরা বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ করে অস্ত্র বানাচ্ছেন তারা আমাদের দেশে বিনিয়োগ করুন' মেক ইন ইন্ডিয়া। আমাদের দেশে অস্ত্র বানাবার পরিকাঠামো শতাব্দী প্রাচীন, তাই সমগ্র দ্রব্য দেশেই বানানো হোক। Made in India-- ভারত জনসমৃদ্ধ দেশ, তাই প্রয়োজন Labourisation-প্রথম, পরে ভাবা যাবে Liberation-এর কথা।

বিহার ও সারা ভারতে ১৭ উপনির্বাচনের ফল বেরোতে সব দল বলছে মোদী ম্যাজিক উধাও। মিডিয়াগুলোও তাদের সঙ্গে লিখছে আসল তথ্য বিচার না করে। বিহারে ৪টা আসন জিতেছে, গতবার জিতেছিল ৬টিতে, কিন্তু গতবার জনসমর্থন পেয়েছিল ৩১ শতাংশ এবার পেয়েছে ৩৮ শতাংশ। লালু-নীতিশ-সোনিয়া সব এক হয়ে পেয়েছে ৪৫ শতাংশ। ১৭টি উপনির্বাচনে বিজেপি পেয়েছে ১৭টির মধ্যে ৭টি অর্থাৎ ৪১ শতাংশ জনসমর্থন। ১৯১৪ সালে পেয়েছিল ৩১ শতাংশ। তাই মোদী ম্যাজিক কি উধাও— এটা পাগলের প্রলাপ মাত্র। ■

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ /
৯২৩৩১৮৯১৭৯

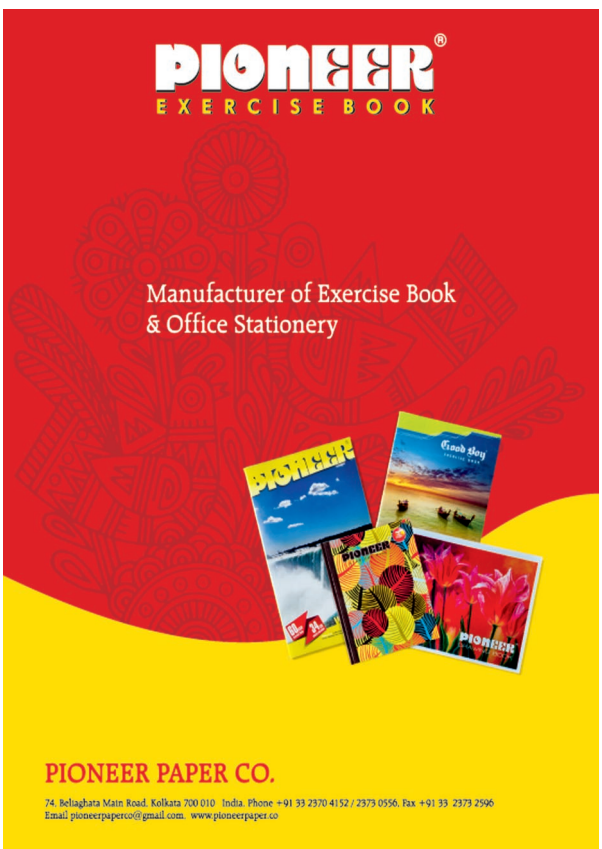

নেত্রদান মহাদান

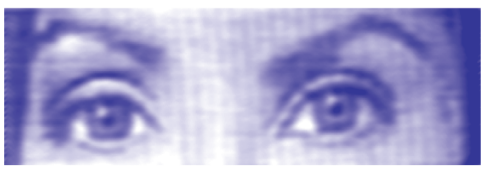

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

ইউনিফর্মের ইউনিফর্মিটি

দেবাংশু ঘোড়ই

কিছুদিন আগেই কলকাতা পুলিশের একটি অনুষ্ঠানে বলিউডের প্রথিতযশা নায়ক শ্রীমান শাহরুখ খানের কোলে উঠে কলকাতা পুলিশেরই এক মহিলা কনস্টেবলের ইউনিফর্ম পরে নাচা নিয়ে ঝড় বয়ে গেল শহরের প্রায় সবকটি দৈনিকে। যে যেরকম

ফাইল চিত্র

পেরেছেন মন্তব্য করেছেন। এঁদেরই মধ্যে কেউ কেউ আবার এই কলকাতা পুলিশেরই প্রাক্তন অফিসার যাঁরা এর আগে এই কলকাতা পুলিশেরই পুলিশ কমিশনার ও বিভিন্ন উচ্চ-পদাধিকারী ছিলেন। এছাড়াও রয়েছেন অনেক বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষক যাঁদের মধ্যে উল্লেখ করতেই হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রবীণ শিক্ষক অমল মুখোপাধ্যায়ের উক্তি। তিনি বলেছেন, ''ডিউটি ছাড়া পুলিশের উর্দি পরবে না, এটাই নিয়ম। সামাজিক অনুষ্ঠানে উর্দি পরে যাবে কেন!'' প্রাক্তন পুলিশকর্তাদেরও অনেকে বিষয়টাকে সুনজরে দেখেননি। রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজি অরুণপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, ''না করাটাই বাঞ্ছনীয়। তবে কি পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনা ঘটেছে, তা সেখানে উপস্থিত পুলিশকর্তারাই বলতে পারবেন।''

একটু দেখে নেওয়া যাক এই কলকাতা পুলিশের আইনে বা 'পুলিশ রেগুলেশন, ক্যালকাটা ১৯৬৮-র ২১তম পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়ে 'ইউনিফর্ম ও ক্লদিং' সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আছে। এই রেগুলেশন ছাড়াও কলকাতা পুলিশের আরও একটি আইন আছে যা The Calcutta Police Act, 1866 বা Bengal Act IV of 1866 বলে বহুল পরিচিত কিন্তু তাতে ইউনিফর্ম ও ক্লদিং সম্বন্ধে কোনো রকমের বিশদ বিবরণ নেই বললেই চলে। Chapter XXI-এর Regulation 10-এ বলা আছে— Uniform to be worn whenever on duty-- (a) All subordinate Police officers shall appear in uniform, whenever on duty, unless otherwise ordered by a superior police officer.

Exception : Officers attached to the Detective Department, Special Branch and Special Staff, Port Police and Enforcement Branch will not wear uniform unless specially ordered to do so. (b) Police Officers off duty may wear either uniform or plain clothes but never partly uniform and partly plain clothes.

অর্থাৎ Regulation 10 (a) অনুযায়ী সকল পদমর্যাদাধীন পুলিশ অফিসারেরই ইউনিফর্মে থাকা বাধ্যতামূলক বিশেষত যখন তারা ডিউটি-রত অবস্থায় থাকবেন। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম তখনই হবে যখন তাঁরা তাঁদের উচ্চপদস্থ কোনো পুলিশ অফিসার থেকে আদেশ পাবেন।

১০ নম্বর রেগুলেশন অনুযায়ী এই ইউনিফর্ম পরার উপর কিছু ব্যতিক্রমও আছে সেটি হলো যেসব অফিসাররা ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট, স্পেশাল ব্রাঞ্চ এবং বিশেষ কর্মী, পোর্ট পুলিশ এবং এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের সঙ্গে যুক্ত আছেন বা থাকবেন শুধুমাত্র তাঁদের ইউনিফর্ম পরতে হবে না যতক্ষণ না তাঁরা কোনো বিশেষ নির্দেশ পাচ্ছেন।

Regulation 10 (b) অনুযায়ী পুলিশ অফিসারদের যখন কোনো ডিউটি থাকবে না তাঁরা ইউনিফর্ম বা সাধারণ পোশাকে থাকতে পারেন কিন্তু কোনোভাবেই আংশিকভাবে ইউনিফর্ম এবং আংশিকভাবে সাধারণ পোশাকে থাকতে পারবেন না।

এতো গেল কখন ইউনিফর্ম পরবেন এবং কখন পরবেন না। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশে অর্থাৎ কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে বা পাবলিক ফাংশানে কলকাতা পুলিশের কোনো অফিসার বা কনস্টেবল তাঁদের নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরতে পারবেন কিনা। Police Regulations, Calcutta 1968-এর Regulation 12 অনুযায়ী বলা আছে Prohibition to wear uniform in social or public functions –Police officers are forbidden to attend social

and similar functions, e.g., meetings, entertainments, cinemas, theatres, races etc. in uniform unless on duty, or unless uniform is prescribed. যার বাংলা তরজমা করলে দাঁড়ায়, কলকাতা পুলিশ অফিসারেরা কোনোরকম সামাজিক এবং ওই জাতীয় কোনো অনুষ্ঠানে যেমন, কোনো মিটিং, সিনেমা, বিনোদনমূলক কোনো অনুষ্ঠান, থিয়েটার, রেস প্রভৃতিতে কোনো ভাবেই অংশগ্রহণ করতে পারবেন না ইউনিফর্ম পরে, যদি না তাঁরা ডিউটিতে নিযুক্ত থাকেন অথবা তাঁদেরকে ওই ইউনিফর্ম ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

উপোরোক্ত নিয়মাবলী থেকে দুটো জিনিস পরিষ্কার। প্রথমত, এই যে কলকাতা পুলিশের কোনো পদমর্যাদাধীন কর্মচারীই ডিউটি ছাড়া ইউনিফর্মে থাকতে পারবেন না। আবার থাকতেই পারেন অফ ডিউটিতে কিন্তু সম্পূর্ণ ইউনিফর্ম পরা অবস্থায়। কিন্তু একটু ভেবে দেখুনতো একজন কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল যিনি আবার একজন মহিলাও বটে এবং তাঁরই দপ্তরের কোনো অনুষ্ঠানে আসছেন আবার যেখানে শাহরুখ খানের মতো কোনো তারকা সেখানে অফ ডিউটিতে সম্পূর্ণ ইউনিফর্ম পরা অবস্থায়। আর যাই হোক এটা কোনো ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। সুতরাং এটুকু পরিষ্কার যে সেদিন ওই মহিলা কনস্টেবলটি ডিউটিরত অবস্থাতেই ছিলেন। দ্বিতীয়ত, কোনোরকম সামাজিক ও বিনোদনমূলক কোনো অনুষ্ঠানেই পুলিশ অফিসার বা পদমর্যাদাধীন কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন না ইউনিফর্ম পরে যদি না তাঁরা ডিউটিতে নিযুক্ত থাকেন অথবা তাঁদেরকে ওই ইউনিফর্ম ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে এটা পরিষ্কার যে অনুষ্ঠানের দিন ওই মহিলা কনস্টেবলটি ডিউটিরত অবস্থাতেই ছিলেন আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে তাঁকে ইউনিফর্ম ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাহলে তাঁকে কি একথাও বলা হয়েছিল যে তিনি সুযোগ পেলে শাহরুখ খানের কোলে উঠে নাচবেন, যেখানে স্বয়ং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী-ই হাজির ছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (সদর) বলেছেন, ''এটা তো নিজেদের, পুলিশ পরিবারের অনুষ্ঠান। বাইরের জনগণ তো সেখানে ছিল না।'' শুধু তাই নয় স্বয়ং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীই তো ওই অনুষ্ঠানের সূচনায় বলেছিলেন, ''পুলিশ সারা বছর রোদে পুড়ে, জলে ভিজে কাজ করে। উৎসবে আনন্দ করতে পারে না। তাই তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি।'' মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তো শুধু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীই নয় রাজ্যের গৃহমন্ত্রীও বটে, তাই তাঁকে সহ কলকাতা পুলিশের সকল আধিকারিককেই অনুরোধ করব যদি পারেন Police Regulations, Calcutta 1968-টা একটু ভালোভাবে পড়ুন, কারণ ওই রেগুলেশনের কোথাও 'নিজেদের বা পুলিশ পরিবারের অনুষ্ঠানের' উপর কোনোরকম বিধান দেওয়া নেই বরং শুধু সামাজিক ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানেরই কথাই বলা আছে। সুতরাং অনুষ্ঠান মাত্রেই যে সামাজিক ও বিনোদনমূলক একথা বলাতে বা বুঝতে কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়, তা সে যতই নিজেদের বা পুলিশ পরিবারের হোক।

'পরিবর্তনের সরকার'-এর তো অনেক পরিবর্তন-ই দেখলাম, এখন দেখা যাক Police Regulations, Calcutta 1968-তে নিজেদের বা পুলিশ পরিবারের অনুষ্ঠানের জন্য কোনো নতুন পরিবর্তন সংযোজন হয় কিনা।

(লেখক আইনজীবী, কলকাতা হাইকোর্ট)

জাতীয় স্তোত্র অপমানের দায়ে ধৃতের জামিন দিল না আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় স্তোত্র (ন্যাশনাল অ্যানথ্যাম)-কে অপমানের দায়ে ধৃত এম সলমন (২৫)-এর জামিনের আবেদন বাতিল করল কেরলের তিরুবনন্তপুরম জেলা দায়রা আদালত। সরকারি প্রেক্ষাগৃহে যখন সিনেমায় 'জাতীয় স্তোত্র' অর্থাৎ 'জনগণমন অধিনায়ক' গাওয়া হচ্ছিল তখন সলমন দাঁড়ায়নি এবং চিৎকার করে বিদ্রূপ করছিল। এই অভিযোগে আই পি সি-র ১২৪ এ ধারায় পুলিশ সলমনকে গ্রেপ্তার করে। এছাড়াও আই টি আইনের ৬৬ এ ধারাতেও তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, কেননা সে ফেসবুকে জাতীয় পতাকা সম্পর্কে অমর্যাদাকর মন্তব্য করেছে। গত ১৫ দিন ধরে সলমন জেল হেফাজতে আছে।

সলমনের জামিনের আবেদন না-মঞ্জুর করে আদালত বলেছে, সলমনের আচরণ জাতীয়তা বিরোধী এবং হত্যার থেকেও গুরুতর অপরাধ। সলমন ছাড়াও রাষ্ট্রদ্রোহের এই মামলায় আরও পাঁচজন অভিযুক্ত রয়েছে যাদের মধ্যে দু'জন মহিলাও রয়েছে। এদের মধ্যে একজন আগাম জামিন পেলেও বাকিরা পলাতক।

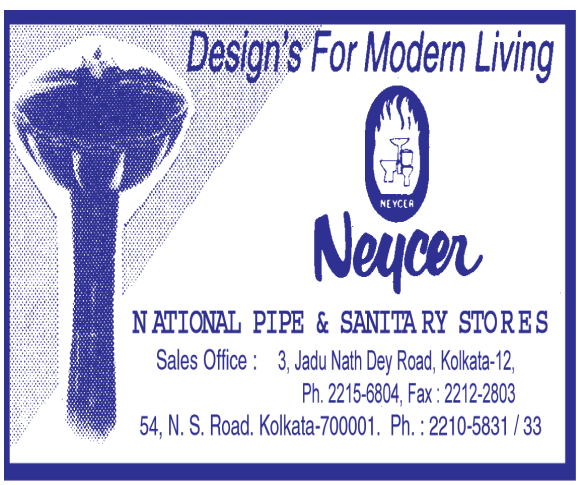

দশ লক্ষ বৃক্ষরোপণের মহান সঙ্কল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পরিবেশ দূষণ আজ এক ভয়াবহ সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি, ওজোনস্তর ফুটো হওয়া, গ্লেসিয়ার ও গঙ্গোত্রীর বরফ গলে যাওয়া, ঋতুচক্রের পরিবর্তন, কোথাও অনাবৃষ্টি, কোথাও অতিবৃষ্টি— এসব পৃথিবীর মানুষের ভোগবাদী সমস্যার পরিণাম। সবাই অনুভব করছেন— এই সমস্যার তীব্রতা কম করার জন্য প্রাকৃতিক বনাঞ্চল রক্ষা করা এবং আধিকাধিক বৃক্ষরোপণ করা প্রয়োজন। একমাত্র ও প্রভাবী উপায়ও আমাদের কাছে আছে।

শ্যামজী গুপ্তা ও ললনকুমার শর্মা বৃক্ষরোপণ করছেন।

আমাদের পূর্বপুরুষরা অনেক আগেই বলেছেন— 'একটি গাছ একটি প্রাণ'। আমরা যে গাছ লাগাই এরকম এক একটি গাছ লাখ টাকার মূল্যের সেবা বা উপকরণ আমাদের দিয়ে থাকে। একটি গবেষণা অনুসারে, একটি গাছ তার একশ' বছরের জীবনকালে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন, ছায়া, ফল-ফুল, জ্বালানি, চারাগাছ, ভূমি সংরক্ষণ, জলসংরক্ষণ, পশুপাখির আবাসস্থল ইত্যাদি অনেক রূপে প্রায় ২১ লক্ষ টাকার লাভ প্রদান করে।

গাছের এই গুরুত্ব মনে রেখে 'একল বিদ্যালয়' তাদের 'স্বাভিমান জাগরণ অভিযান'-এর অন্তর্গত বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। স্বাভিমান জাগরণ অভিযানের কেন্দ্রীয় মার্গদর্শক ললন কুমার শর্মা জানান— 'আগামী এক বছরে একল বিদ্যালয় ১০ লক্ষ গাছ লাগানোর সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে। এই যোজনা অনুসারে প্রতিটি একল বিদ্যালয় (One Teacher School)-এর বর্তমান ৩০ জন ছাত্রছাত্রী এবং প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী যারা বিভিন্ন গ্রামে আছে এরকম প্রতিটি গ্রামে কমপক্ষে ৫০টি গাছ লাগাবে। যোজনা অনুসারে কেবল একল বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাই এক বছরে ১০ লক্ষ গাছ লাগানো সঙ্কল্প পূর্ণ করবে।

বৃক্ষরোপণকারীরা গাছ লাগিয়ে তার ঘেরাটোপের গায়ে নিজের নাম লিখে রাখবে। নিজের পরিবারের সদস্যের মতো তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও সে গ্রহণ করার প্রতিজ্ঞা করবে। এই বৃক্ষরোপণ অভিযানে ফলের গাছ, আসবাবপত্র ও ইমারতির কাঠের গাছ, ভেষজ-সহ বিভিন্ন রকমের গাছ লাগানো হবে। এর ফলে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের বিস্তার হবে।

শ্রীশর্মা বলেন, যে কোনো অভিযানে যখন সাধারণ লোকেরা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন তখন সেটা আন্দোলনে পরিণত হয়। এজন্য সাধারণ লোকেদের এই আন্দোলনে যুক্ত করার জন্য একল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্য সংস্থাকে বৃক্ষরোপণ অভিযানে সহভাগী হওয়ার জন্য আবেদন নিয়েছে। ইতিমধ্যে সারাদেশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে।

এই অভিযানের শুভারম্ভ করেছেন বিশ্বপরিবেশ দিবসে গুজরাটের শ্রী সন্তরাম রামমন্দিরের পূজ্য স্বামীজী। গুজরাটের নাড়িয়াড়ে সারাদেশ থেকে আসা একল বিদ্যালয়ের কার্যকর্তাদের যোজনা বৈঠকে এর সূচনা হয়।

স্বামীজীর সঙ্গে সেদিন একল অভিযানের কেন্দ্রীয় সংগঠন কর্মকর্তা শ্যামজী গুপ্তাও বৃক্ষরোপণ করেন। সেদিন নাড়িয়াড়ে পরিবেশ সংরক্ষণ সঙ্কল্প যাত্রারও আয়োজন করা হয়েছিল। বন ও প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের আধিকারিককরা উপস্থিত থেকে বৃক্ষরোপণ সঙ্কল্প অভিযানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ■

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER
OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company
'Park Plaza'
71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–
emil : roy4258@yahoo.com,
web : www.calcuttawaterproofing.com

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার,
গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের
কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"সর্বোপরি, হিন্দু হিসাবে আমাদের কর্তব্য জগৎকে বিভিন্ন আদর্শ দ্বারা বিধৃত করা। নতুন কোন তত্ত্বের অন্তরালে কোন্ আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে, আমাদের তারই অনুসন্ধানে সচেষ্ট হতে হবে।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

স্বয়ংসেবক অমলদা

কেশব দীক্ষিত

১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি গান্ধী হত্যার অভিযোগে নেহরু সরকার সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে কয়েক হাজার কার্যকর্তাকে জেলে ভরে। তখন অমলদা (অমলকুমার বসু) আজকের মহাকোশল প্রান্তের জব্বলপুরে বিভাগ প্রচারক ছিলেন। তিনি তখন কারাবরণ করে নিজে কারাবন্দী স্বয়ংসেবকদের উৎসাহ ও প্রেরণা দিতেন।

বঙ্গবাসী হলেও তাঁর বাবা মধ্যভারতে ধার শহরে ওকালতি করতেন। অমলদা স্কুলছাত্র হিসেবে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। জব্বলপুরের মিশনারি কলেজে পড়ার সময় অমলদা একনাথ রানাডের ঘনিষ্ঠ হন। বাল্যকাল থেকে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ছিলেন কিন্তু একনাথজীর সান্নিধ্য পাওয়ার ফলে সঙ্ঘকাজে সর্বস্ব অর্পণ করার প্রেরণা লাভ করেন এবং বিদেশে পড়াশুনা করার সুযোগ পেয়েও প্রচারক হয়ে বেরিয়ে পড়েন।

১৯৪৯ সালে জুলাই মাসে সঙ্ঘের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। সেই সময় একনাথ রানাডে শ্রীগুরুজীর সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করার ফলে পূর্বাঞ্চলের সঙ্ঘকাজের দায়িত্ব একনাথজীর উপরই ন্যস্ত করেন এবং সারাদেশে ভ্রমণ করে প্রয়োজন মতো প্রচারক খুঁজে নিতে বলেন। একনাথজী কয়েকটি প্রদেশে ভ্রমণ করে বেশ কয়েকজন প্রচারককে নির্বাচিত করেন এবং তার মধ্যে অমলদাকে মধ্যপ্রদেশ থেকে কলকাতায় নিয়ে আসেন ও কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলের প্রচারক হিসাবে নিযুক্ত করেন।

সঙ্ঘকাজ পুনরায় চালু হওয়ার পর শ্রীগুরুজী কলকাতায় আসেন। তখন দেশবন্ধু পার্কে সঙ্ঘের একটি প্রকাশ্য কার্যক্রম অমলদা সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেন। ১৯৫০ সালে তাঁকে সহ-প্রান্ত প্রচারকের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং সেই বছরে পূর্বাঞ্চলের প্রচারক বর্গে তাঁকে প্রান্তপ্রচারক ঘোষণা করা হয়। সেই সময় দেশভাগের দরুন লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু কলকাতার আশেপাশে বিভিন্ন শিবিরে ছিলেন। অমলদা নিপুণ ভাবে স্বয়ংসেবকদের নিয়ে উদ্বাস্তু শিবির পরিচালনা করেন। তখন উদ্বাস্তু ছেলেদের স্বনির্ভর করার পরিকল্পনা নিয়ে জোড়াবাগানে বাস্তুহারা মেকানিক্যাল হোম চালু করা হয়। তার পরিচালনার দায়িত্বও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকার প্রিন্টিং প্রেস চালানোর চেষ্টা করেন।

বিভিন্ন কারণে প্রচারকের দায়িত্ব পালন করতে অসুবিধা থাকার ফলে '৬১ সালে তাঁকে প্রান্তকার্যবাহ ঘোষণা করা হলো। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ফলে 'মিশা'-তে হাজার হাজার স্বয়ংসেবককে কারাবরণ করতে হলো। অমলদাকে বাস থেকে গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠানো হয়। তখন তিনি ডায়মন্ডহারবার বি টি কলেজে অধ্যাপনা করতেন। জেলবন্দী অবস্থাতে স্বয়ংসেবকদের নিষ্ঠা ও কর্তব্যের প্রমাণ পাওয়া গেল। সারাদেশে সঙ্ঘযোজনা অনুসারে সমস্ত জেলখানায় বিভিন্ন দাবিতে বন্দিরা দীর্ঘকালীন অনশন সত্যাগ্রহ আরম্ভ করে এবং সপ্তাহখানেক পর কিছু দাবি মানার ফলে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। প্রত্যাহারের সূচনা জনসংঘর্ষ সমিতি দ্বারা ঘোষণা করা হলেও সঙ্ঘের সূচনা না আসার ফলে অমলদা অনশন চালিয়ে যান এবং ২১ দিন পরে ভাউরাও দেওরসজীর পত্র পেয়ে অনশন ভঙ্গ করেন। কারাগারে জামাতে ইসলামির নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। সেজন্য মুক্তি পাওয়ার পর তাঁদের পক্ষ থেকে মহম্মদ আলি পার্কে অমলদাকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

১৯৭৭ সালে জনতা পার্টির রাজত্ব শুরু হলে সঙ্ঘের কাজ আবার পূর্ণ উদ্যমে শুরু হয়। সে সময় বালাসাহেব দেওরসজীর উপস্থিতিতে অমলদাকে পুনরায় প্রান্তপ্রচারক নিযুক্ত করা হয়। ১৯৭৯ সালে প্রয়াগে বিরাট হিন্দু সম্মেলনে চারদিন মাঠে দাঁড়িয়ে তিনি বাংলার শিবিরের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। ১৯৭৯ সালে কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর অকাল মৃত্যুর কারণে অমলদাকে প্রান্ত সঙ্ঘচালক ঘোষণা করা হয় নাগপুরে কার্যকারিণীর বৈঠকে। ১৯৮৫ সালে শেষাদ্রিজীর উপস্থিতিতে প্রান্ত সঙ্ঘচালক পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে পূর্বক্ষেত্রের বিদ্যাভারতীর সভাপতি ঘোষণা করা হয়।

প্রান্তপ্রচারক, প্রান্ত কার্যবাহ, প্রান্ত সঙ্ঘচালক, বিদ্যাভারতী, স্বস্তিকার প্রিন্টিং প্রেস, বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সভাপতি, স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের অছি, হেডগেওয়ার স্মারক সমিতির সভাপতি ইত্যাদি নানান দায়িত্ব স্বয়ংসেবকোচিত ভূমিকায় পালন করেন। বার্ধক্যজনিত কারণে সব কাজ থেকে মুক্তি নিয়ে কলকাতায় কেশব ভবনে সকলের অভিভাবক হিসাবে থাকতেন। ভগবানের ডাকে গত ১০ সেপ্টেম্বর প্রভাতে সূর্যোদয়কে সাক্ষী রেখে অনন্তে বিলীন হন এই কর্মবীর।

(লেখক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক ও প্রাক্তন সহ-ক্ষেত্র প্রচারক।)

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি কপি ১০ টাকা।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

স্বর্গীয়
অমল কুমার বসু

রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

অমলদা (৺অমলকুমার বসু) আর আমাদের মধ্যে নেই। পিতৃপক্ষের প্রথম দিনে গত ১০ সেপ্টেম্বর বুধবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহলোক ত্যাগ করে পিতৃলোকের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। বার্ধক্যজনিত অশক্ত শরীরে সক্রিয় ভাবে সঙ্ঘের কাজ, দেশের কাজ করতে পারছিলেন না। কাজেই এই জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নবজন্ম নিয়ে ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পরম করুণাময় ঈশ্বর এই পুণ্য দিনে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। এক গৌরবোজ্বল আদর্শ চরিত্র দেশভক্তের জীবনাবসান হলো।

১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি আমি আমার ভাইদের নিয়ে সঙ্ঘের শাখায় যোগ দিই। তখন থেকেই অমলদার সঙ্গে পরিচয়। তিনি অত্যন্ত রাশভারী, মেধাবী, সুবক্তা এবং অনুকরণীয় আদর্শ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতৃদেব দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার ডায়মন্ডহারবার এলাকার নামকরা জমিদার বংশের সন্তান ছিলেন। তিনি মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায় বিখ্যাত উকিল হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সুবাদে অমলদার পড়াশুনা মধ্যপ্রদেশে। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখায় যোগ দেন। ইংরাজি-সহ তিন বিষয়ের ওপর এমএ এবং এল এল বি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম বিভাগে সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি সঙ্ঘের প্রচারক জীবন বরণ করেন এবং আমৃত্যু সেই ব্রত পালন করে গেলেন।

১৯৪৮ সালে গান্ধী হত্যার মিথ্যা অজুহাতে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। দিল্লী হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চের গান্ধী হত্যার বিচারে সঙ্ঘ নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় ১৯৪৯ সালের শেষদিকে সঙ্ঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। নতুন করে সঙ্ঘের কাজ শুরু করার জন্য দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক পরমপূজনীয় শ্রীগুরুজী পূর্ব ক্ষেত্রের প্রচারক হিসাবে একনাথ রাণাডেকে কলকাতায় পাঠান। একনাথজী মধ্যপ্রদেশ থেকে অমলদাকে এনে বাংলার প্রান্ত প্রচারকের দায়িত্ব দিলেন। ১৯৫০ সালে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তান সরকার (বর্তমান বাংলাদেশ) হিন্দু নিধন ও হিন্দু বিতাড়ন যজ্ঞ শুরু করল। লক্ষ লক্ষ হিন্দু একবস্ত্রে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এবং কলকাতায় আশ্রয় নিতে লাগল। একনাথজী এবং অমলদা স্বয়ংসেবকদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন উদ্বাস্তুদের সেবাকাজে। ব্যারিস্টার রণদেব চৌধুরীকে সভাপতি করে তৈরি হলো 'বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি'। সেই সমিতি আজও বাংলায় সেবাকাজ করে চলেছে। সেই সময় উদ্বাস্তুদের অন্ন, বস্ত্র, গৃহস্থালির সামগ্রী, ত্রিপল ইত্যাদি বিতরণের জন্য বাংলা জুড়ে যাঁরা এই 'কর্মবীরের' চেহারা দেখেছেন তাঁরা সকলেই তাঁর গুণমুগ্ধ হয়েছেন।

আজ আমরা সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা' পত্রিকার যে গৌরবোজ্বল অবস্থা দেখছি এর পেছনেও অমলদার দীর্ঘ ও সক্রিয় অবদান বিদ্যমান। আজ বাংলায় 'বিবেকানন্দ বিদ্যা বিকাশ পরিষদ'-এর শত শত বিদ্যালয় দেখতে পাই। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন তিনি। তখনকার দিনে সঙ্ঘের শীত শিবির নির্মাণের যাবতীয় কাজ স্বয়ংসেবকদের নিজেদের হাতে করতে হোত। অমলদা তাবু খাটাতে ও অস্থায়ী শৌচালয় নির্মাণেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

১৯৫০-৬০ এর দশকে সারাদেশ জুড়ে সঙ্ঘের চরম অর্থকষ্ট ছিল। একনাথজী বাংলার প্রচারকদের বললেন, দুপুরে আংশিক সময়ের চাকরি করে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করতে হবে। কাজেও তাই হলো। অমলদা বি এড এবং এম এড পাশ করে নব ব্যারাকপুর বি টি কলেজে অধ্যাপনার কাজ শুরু করলেন। পরে তিনি ওই কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন। বাংলার প্রান্ত প্রচারক, প্রান্ত কার্যবাহ এবং প্রান্ত সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। পরে বিদ্যাভারতীর পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বও বহন করেছেন। সঙ্ঘের কাজে তিনি তিনবার কারাবরণ করেছেন। তিনি তাস খেলার উদাহরণ দিতেন। ওই খেলায় ডাকের উত্তরে কোনো খেলোয়াড় বলে 'আছি'। তিনি বলতেন বিশ্বের প্রাচীনতম এবং শ্রেষ্ঠতম ধর্ম সংস্কৃতির সংরক্ষণ করে বৈভবসম্পন্ন হিন্দুরাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে দৈবী কর্মযজ্ঞ আজ দেশব্যাপী তথা বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ চালাচ্ছে সেই কর্মযজ্ঞে 'আমি আছি' একথা বলতে হবে। তিনি বলেছিলেন 'আমি আছি' এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ব্রত পালন করে গেছেন। তাঁর প্রয়াত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন তখনই সার্থক হবে যখন আমরাও মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারব 'অমলদা, আমরাও আছি।'

(লেখক পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক)

‘মৃত্যুর মন্থর পথে যে পান্থ চলিয়াছে অমৃত-লোকের পানে’

তুষারকান্তি ঘোষ

অমলদা চলে গেলেন। ৺অমলকুমার বসু যিনি পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘকার্যের বিশাল স্থপতি ছিলেন— যিনি আমাদের মতো পুরনো স্বয়ংসেবকদের কাছে গতিময় জীবনের এক প্রেরণাপুরুষ ছিলেন। যিনি মানুষের আত্মার বিরুদ্ধে যান্ত্রিক সভ্যতার অভিযানের নিরন্তর প্রতিবাদ করেছিলেন— আজ তিনি চলে গেলেন অমর্ত্যলোকে।

আমরা বালক অবস্থা থেকেই অমলদার স্নেহপরশে মানুষ। সারা পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় অধিকারী ছাড়া সঙ্ঘকার্যে ভ্রমণের ক্ষেত্রে অমলদা'ই তখন ছিলেন ‘সন্ন্যাসী একা যাত্রী’। প্রতিটি জেলাতে পাঁচের দশকে অমলদারই ভ্রমণসূচি থাকত। স্বয়ংসেবকদের বৈঠক, কার্যকর্তাদের বিশেষ বৈঠক এবং আবশ্যিক ভাবে নাগরিক বৈঠক।

১৯৪৮-এ গান্ধীহত্যার ঘটনার পর পাঁচের দশকটাই সঙ্ঘের উপর মিথ্যাপ্রসূত তীব্র আক্রমণ চালাত কংগ্রেস ও কম্যুনিস্টরা। সেই পটভূমিকায় নাগরিক বৈঠকগুলোতে সঙ্ঘআদর্শ ও সঙ্ঘের কার্য পদ্ধতির এক অপূর্ব রূপরেখা তুলে ধরতেন অমলদা। তাঁর আবেগপূর্ণ, যুক্তিনিষ্ঠ ও মধুর ভাষণ মানুষের হৃদয়ে মুহূর্তেই রেখাপাত করতো। অমলদা বলতেন— ‘‘যে ধর্মে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি সেটাও তো আপনাদের ধর্ম। আমরা সমাজ ও ধর্মকে সংস্কারিত করছি, ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে বের হয়ে এসেছি, হিন্দু সমাজে এক সুরক্ষার বলয় তৈরি করেছি— আর আপনারা সুরক্ষার সেই বলয়ে বাস করে আমাদেরই ঘৃণ্য ভাষায় আক্রমণ করছেন। জাতির এই ক্লীবতা ও দ্বি-চারিতার জন্য কয়েক বছর আগে আমরা আমাদের দেশকে খণ্ডিত করেছি তবুও আমাদের আত্মজ্ঞান ফিরেনি।

দুর্ভাগ্য যাঁরা দেশকে সাম্প্রদায়িকতার যূপকাষ্ঠে বলি দিলেন আজ তাঁরাই হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করে বড় বড় বাক্য ব্যবহার করছেন। তাঁরা জানেন না সঙ্ঘের কাজের গতি প্রাকৃতিক। যে পরম সত্তা, যা শাশ্বত এবং সত্য, যার দ্বারা মানুষের আত্মোৎকর্ষ হয়— সেই সাধনা ও তপস্যার নামই হিন্দুধর্ম। অনন্তকাল ধরে বিশ্বসৃষ্টির যে খেলা চলছে, হিন্দুধর্ম মানুষের সেই জীবনযাত্রার স্রোতকে পরম

১৯৭৮ সালে কলকাতায় তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসের সঙ্গে অমলদা। একেবারে বাঁ দিকে ডা: সুজিত ধর।

ব্রহ্মের একই লীলা বলে অনুভব করেছে— সকল সৃষ্টির মধ্যে এক পরম ঐক্যবোধ ও অখণ্ডতার প্রকাশ বলে জেনেছে। শুধু জানেনি, সেই মতো জীবনকে রচনা করেছে। এই অধ্যায় ও বৃহত্তর চিন্তাধারা নিয়েই সঙ্ঘের কাজ। এই জন্যই আমরা, আমাদের প্রচারকেরা জীবন ধরে সাধনা করে চলেছি। যদি আমাদের প্রতি বিশ্বাস না থাকে তবে এই কাজের প্রসারের জন্য আপনারা সংসার থেকে বের হয়ে এসে জাতিকে পথ দেখান— আমরা আপনাদের উপর বিশ্বাস নিয়েই সংসারে ফিরে যাই।’’

অমলদার এই ধরনের বক্তব্যে নাগরিক বৈঠক স্তব্ধ হয়ে যেত। কারণ তিনি সমাজকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে সঙ্ঘের কাজ প্রকৃত রাষ্ট্র নির্মাণের কাজ। এই কাজ ঈশ্বরীয় কাজ। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলতেন এই কাজ জগন্নাথের রথের মতো। এই রথের চালনার জন্য দড়ি ধরার লোক আছে। আপনারা রাস্তার পাশে নিশ্চুপ হয়ে দেখলেও জগন্নাথের রথ চলবে। কারণ এই রথ সমাজের রথ, ধর্মের রথ।

মালদহে এলে সঙ্ঘের কোনো কার্যক্রম না থাকলে তিনি আমাদের বাড়ি যেতেন। অমলদা আমাদের স্বয়ংসেবকদের বাড়িতে পরমাত্মীয়ের মতো ছিলেন। অমলদা এলে বংশীদাকে দেখতাম অমলদার জন্য তৎপর হয়ে উঠতেন। বিছানায় একটা ভাল চাদর পাততেন। বংশীদা অমলদাকে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করতেন। অমলদা বংশীদাকে নাম ধরে ডাকতেন।

১৯৬০ সালে গৌড়ে একটা ট্রিপ

(বনভোজন) ছিল। শ' দুয়েক স্বয়ংসেবক আমরা যোগ দিয়েছি। বারদুয়ারীতে রান্নাবান্না হচ্ছিল। ৫৪ বছর আগেকার গৌড় তখন অনেকটাই জঙ্গলা গাছে ভরা। ফিরোজ মিনারের কাছে এসে স্বয়ংসেবকেরা উপরে উঠতে চাইলো। বংশীদা বাধা দিলেন। প্রথমত, এত স্বয়ংসেবকের উপরে উঠা-নামায় প্রচুর সময় লাগবে। দ্বিতীয়ত, অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ও বাদুড়ের উপদ্রবে যদি কোনো বিপদ আসে। বংশীদার মিলিটারি ডিসিপ্লিনে প্রায়ই সবাই তখন ক্ষুব্ধ। আমি তখন সিঙ্গাতলা শাখার মুখ্য শিক্ষক। ১৯৫৯-এ শাখা শুরু করেছি— ফলে বালকদের আগ্রহ বেশি ছিল। দেখলাম অমলদা এগিয়ে এলেন। দু'জন তরুণ স্বয়ংসেবককে উপরে পাঠিয়ে দিলেন। আর শুধুমাত্র বালক স্বয়ংসেবকদের জন্য উঠার অনুমতি অমলদা দিলেন। তখন ফিরোজ মিনার থেকে রাজমহল পাহাড় দেখা যেত। বালকেরা এসব দেখে খুবই খুশি।

বংশীদা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন অমলদার ধমক খেয়ে। অমলদা কাছে এসে বললেন, ''বংশী, ট্রিপের কার্যক্রম হলো আনন্দের। এই আনন্দের মধ্যে অনুশাসনকে মিশানোর জন্য মধুর হতে হবে। অনুশাসন যেন আনন্দের প্রতিবন্ধক না হয়— তেমনি অনুশাসনবিহীন আনন্দে যেন উচ্ছৃঙ্খলতা না আসে।''

আসলে অমলদা প্রতিটি মানুষের জীবনকে এক অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি অনুভব করতেন— মাটির তলায় হীরা জহরত কোথায় লুকিয়ে আছে তা উপর থেকে বোঝা যায় না, এর জন্য অভ্যন্তরে সন্ধান চালাতে হয়। মানুষের জীবনের ক্ষেত্রেও একই স্বরূপ। মানুষের জীবনের মূল্যবান হীরকখণ্ড যা মানুষের চৈতন্যকে ধরে রাখে— তার সন্ধানের একমাত্র উপায় মানুষকে অন্তর দিয়ে ভালবাসার এক সাধনা।

১৯৫৯ সাল। শ্যামনগরে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ হচ্ছে— বাংলা, বিহার, অসম ও ওড়িশার। এই চার প্রদেশের মিলিত রূপে ভারতের এক খণ্ডাংশের খোঁজ পাওয়া যায়। বর্গের শুরুর দিন প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর সকালবেলা স্বল্পাহার হিসেবে দেওয়া হলো দুটো আলু সিদ্ধ আর একটু লবণ। আমরা হতচকিত। আমাদের আকুল জিজ্ঞাসা— নিশ্চয়ই আরও কিছু দেবে এর সঙ্গে। কিন্তু বিভ্রম কাটল— চর্চা ক্লাস শুরুর ঘণ্টা বেজে যাওয়ায়। কেউ কেউ ক্ষুধার তাড়নায় দু-এক বার কামড় দিল— অনেকেই আধ-সিদ্ধ আলু খেল না। ফেলে দিল।

চর্চা শেষে যখন স্নান করতে যাব তখন দেখি অমলদা বৌদ্ধিক মণ্ডপে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছেন। আমরা অমলদার কাছে পৌঁছলাম। অমলদা কাছে টেনে নিলেন। মুহূর্তেই 'আমাদের জীবনের দুঃখভরা বেদনার্ত প্রাতঃরাশের কাহিনী' বর্ণনা করলাম। অমলদা চমকে উঠলেন; বললেন, দুটো করে আলু সিদ্ধ খেয়েছিস? ঠিক আছে, সব স্নান করতে যা— এই সব দেখব পরে। পরদিন দেখলাম চার প্রদেশের স্বল্পাহারের সময় অমলদার তত্ত্বাবধানে স্বল্পাহার পরিবেশন হচ্ছে— কাবলি মটরের ঘুঘনি আর মুড়ি সঙ্গে পেঁয়াজের টুকরো।

হৃদয়ে দাগ কাটা এই ঘটনাটার সম্পর্কে মনে হয়েছিল Edgar lee Master-এর Spoon River Anthology-র কয়েকটা লাইন—

''The earth keeps some
Vibration going
There in your heart
and that is you.''

দিন কয়েক পরেই এক বজ্রকঠোর রূপ দেখলাম অমলদার। শ্যামনগরে আমাদের শারীরিক কার্যক্রমের মাঠটা ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিল 'যুগের প্রতীক' বলে একটি ক্লাব। কোনো এক পরিস্থিতিতে তারা অনুমতি প্রত্যাহার করে নেয়। এক বিচিত্র অবস্থা এসে দাঁড়াল— হয় সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ বন্ধ না তো নতুন কোনো মাঠের সন্ধান। শ্যামনগর স্কুলের পিছনে একটা ফাঁকা জায়গা ছিল। ছোট ছোট খেজুর গাছে, ফণীমনসার ঝোপ ও আঁটি শেওড়ার গাছে ভর্তি। অমলদা সকালে সব স্বয়ংসেবক ও শিক্ষার্থীদের বললেন দুপুরের মধ্যেই এই মঠে যেন পরিষ্কার হয়ে যায়— কারণ বিকালে এই মাঠেই শারীরিক কার্যক্রম হবে। ভোজন আর স্বাস্থ্য বিভাগ ছাড়া সকলেই নেমে পড়ল কাজে। অজস্র মানুষের সঙ্গে আমরা কাজ করছি। হঠাৎ চেতনা ফিরল দেখি অমলদা প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে মাথায় গামছা বেঁধে হাতে একটা কোদাল নিয়ে ফণীমনসার ঝোপ কাটছেন। যেন মিলিটারি জেনারেল মোঁসে দায়নি নিজে বিপদের আগে আগে চলেছেন। যুগের প্রতীকের সদস্যরা স্বয়ংসেবকদের এই অসম্ভব ক্ষমতা দেখে ক্ষমা চেয়ে তাদের মাঠ ফিরিয়ে দিল। কবিরা মানুষের জীবনের কর্মপ্রবাহের মধ্যে জীবনের দর্শন খুঁজে পান— তারই অভিব্যক্তি তাঁরা কবিতায় প্রকাশ করেন। হয়তো বা কোনো কবি অনুভব করেছিলেন— ''I storm and I roar and I fall in a rage and missing my whore, I bugger in my page.''

অমলদার ভাষণ থাকলে দেখতাম সবাই নিশ্চুপ। অসাধারণ বলার ক্ষমতা ছিল। তাঁর উচ্চারিত বাক্যগুলো যেন মিষ্টির আবরণে মোড়া। সেই দিনগুলোতে যাঁদের বৌদ্ধিক শুনেছিলাম আজ আমাদের জীবনে তা গভীর ভাবে অঙ্কিত আছে। আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের ওটিসি-র ভাষণের দিনগুলো ভাগ হয়ে যেত বড় কার্যকর্তাদের মধ্যে। আপ্তেজী ৩ দিন, দীনদয়ালজী ৩ দিন, একনাথজী ৩ দিন, গুরুজী ৩ দিন, থট্টেজী ১ দিন, আচার্য দেবপ্রসাদ ঘোষ ২ দিন, ড. রঘুবীর ১ দিন, রাজাভাউ ডিগবেকরের সংস্কৃত ভাষণ ১ দিন, চার প্রান্তীয় প্রচারক অসম তথা পূর্ব ভারতের রামসিং ঠাকুর ১ দিন, বিহারের মধুকর দেও ২ দিন, বাবুরাওজী পালধিকরের (ওড়িশা) প্রবচন ১ দিন, আর অমলদার ভাষণ ১ দিন। ওটিসি-র জন্য অমলদার খাওয়া দাওয়া বা বিশ্রাম ছিল না। গভীর রাতে উঠে দেখেছি অমলদা প্যান্ডেলের মেরামতির কাজের তদারকি করছেন আর দীনদয়ালজী চৌবাচ্চার কাছে নিজের জামা কাপড় পরিষ্কার করছেন। প্রচারক জীবনের সর্বংসহা এমন ধ্রুপদী ভাবনার জীবনবেদ তো তাঁদের নিত্য অলঙ্কার ছিল, যার ভূষণেই ছিল তাঁদের বর্ণোজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ মানসিকতার প্রকাশ। ওই সব পবিত্র দৃশ্যগুলো দেখে আমাদের মনে হোত আমরা যেন উত্তুঙ্গ হিমালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

অমলদার বড় গুণ ছিল লোকসংগ্রহ ও লোকপ্রিয়তা। তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা বা রাজনীতির ক্ষেত্রের বিশাল ব্যক্তিত্বের সাহচর্য সঙ্ঘের প্রতি খুবই কম ছিল। অমলদা তাই জনসংযোগ করতেন। মালদহের প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী তিন বারের বিধায়ক

কংগ্রেসের শান্তিগোপাল সেনের সঙ্গে তাঁর যেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল তেমনি ছিল আর এস পি প্রমোজ রঞ্জন বোসের সঙ্গে। সিপিআই-এর প্রভাবশালী নেতা শচী রায়, সিপিআই-এর এম এল এ তথা ছোট বেলাকার স্বয়ংসেবক বিমল দাসও অমলদাকে শ্রদ্ধা করতেন। অমলদা মনে করতেন রাষ্ট্র নির্মাণের মহৎ যজ্ঞে সবাইকে নিয়ে আনার মধ্যে এক সার্বজনীন দৃষ্টিকোণ লুকিয়ে থাকে— ভারতবর্ষ বহুত্ববাদেরও সাধনায় জয়ী হয়েছে। অমলদার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্য পঞ্চাশ-ষাট দশকে সকল রাজনৈতিক দলগুলির বহিরাবরণে বিরোধিতা থাকলেও অন্তরে তারা এই রাষ্ট্রনির্মাণ যজ্ঞের কাজকে ভালো চোখেই দেখত। তাই শীতকালীন শিবির বা সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গের জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলো যা তাদেরই পরিচালনায় ছিল সেগুলো পেতে কোনো অসুবিধা হোত না। তাঁরা অমলদাকে এক সম্ভ্রান্ত ও গুণীজন বা রাষ্ট্রের কাজের তপস্বী বলেই মনে করতেন।

তদানীন্তন সঙ্ঘের পরিবেশে অমলদার উচ্চ শিক্ষার আসনে আসীন থাকায় বিষয়টি অধিকতর গৌরবের বস্তু ছিল। কিন্তু অমলদার সারস্বত সাধনা তাঁর বহিরাচরণে বিন্দুমাত্র প্রকাশিত হতো না। যে যুগে শহরে এমএ পাশের সংখ্যা নেহাৎই হাতে গোনা যেত। সেই সময় অমলদা তিনটি বিষয়ে এমএ পাশ করেছিলেন। পাশ করেছিলেন এল এল বি ও এম এড। ব্যারাকপুর বি টি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। অমলদা জানতেন পৃথিবী জুড়ে সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ ও হাল আমলের মাও সে তুং-এর মতবাদ যেভাবে ভারতীয় সনাতনী আদর্শবাদ ও হিন্দুত্বের চিন্তাধারাকে আক্রমণ করে চলেছে তাতে সঙ্ঘের পরিবেশে একদল উচ্চশিক্ষিত স্বাভিমানী যুবকের প্রয়োজন আছে। তিনি জানতেন বিশ্বজুড়ে এই আদর্শবাদের দ্বন্দ্ব প্রকট হবেই এবং এই দ্বন্দ্বে স্বয়ংসেবকদের জিততে হবেই। তাই আত্মানুশীলনের সঙ্গে অধ্যয়নকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তিনি স্বয়ংসেবকদের মধ্যে সেই দৃঢ়তা দেখতে চেয়েছিলেন যে তারা যেন ঘোষণা করবে, "I shall rule unchallenged in the intellectual life of the World." এই চিন্তাধারার মধ্যে তাঁর বিশাল আত্মবিশ্বাস ছিল।

অমলদা ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরে যেতে পারতেন। এক নাগরিক বৈঠকে প্রসঙ্গক্রমে প্রবেশ করেছিলেন উপনিষদের মধ্যে। তিনি সেই বৈঠকে আধ্যাত্মিকতার এক ভাব বৈরাগ্যের তাম্রধূসরতায় নাগরিক জীবনকে আচ্ছাদিত করেছিলেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্য দিয়ে এক ঐশ্বরিক সত্তা চিরন্তন ভাবে বিদ্যমান আছে— খেলতি অণ্ডে খেলতি পিণ্ডে'— এই ঐশীশক্তি বিশ্ব প্রকৃতিতে লীলা করছেন তেমন মানবদেহে মানব প্রকৃতিও লীলা করছেন— শক্তিরূপে, কামরূপে। দুঃখরূপেও মানুষের জীবনে এই শক্তি বিরাজমান। আবার জড় জগতের গতি ও অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যেও এই শক্তি ক্রিয়মান। তাই বৈদিক গ্রন্থে বলেছে— 'হে রুদ্র শিব, তুমি পাতার সৃষ্টিতে আছ তোমাকে প্রণাম, তুমি পাতা ঝরাতেও আছো, তোমায় প্রণাম'। অমলদা বলতেন— নিজের জীবনে এই শক্তিকে অনুভব করা এবং এই শক্তির নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে তাল রেখে নিজের জীবন চালানো এবং নিজের অভ্যন্তরীণ নৈতিক জীবন এবং বাহ্যিক চরিত্রকে এই শক্তির সহজ ও সুষ্ঠু প্রকাশের ক্ষেত্র করে নেওয়া— এই স্থানেই ভগবৎ শক্তির উপলব্ধি সম্ভব হয় এবং এই শক্তির বিকাশই আমাদের ধর্মের সাধনার পথ।"

অমলদা স্বয়ংসেবকদের আত্মার মধ্যে শক্তির জাগরণের উপর কীরকম জোর দিতেন তার একটা জীবন্ত উদাহরণ মনে পড়ে। ১৯৬৪ সালের সম্ভবত ৩১ ডিসেম্বর। বর্ধমানে বাঁকা নদীর তীরে আমবাগানে কার্যকর্তাদের শিবির হচ্ছে। সঙ্ঘের তেমন কোনো আর্থিক অবস্থা

শোকবার্তা

অমলকুমার বসুর পরলোকগমনের সংবাদ পাঞ্জাব প্রবাসের সময় পেলাম। একটি অনৌপচারিক বৈঠকে একত্রিত সব বন্ধুরাই এই দুঃখজনক খবরে স্তম্ভিত হয়ে যাই। মধ্যপ্রদেশের ধারে পড়াশুনা করা ও বড় হওয়া অমলদা প্রচারকরূপে পশ্চিমবাংলায় আসেন। তখন থেকে তাঁর দীর্ঘ সান্নিধ্যের অভিজ্ঞতা আমরা সবাই পেয়েছি। তাঁর কর্মকুশলতা, অনুশাসনপ্রিয়তা, সরল জীবনযাপন, আদর্শনিষ্ঠা এবং সমর্পণভাব আমাদের জন্য 'সৎভাবে, নিঃস্বার্থ বুদ্ধিতে এবং দেহ, মন ও ধন দ্বারা' কাজ করার এক প্রেরণাদায়ী উদাহরণ হিসাবে থেকে গেল। তিনি এরকম বিরল প্রচারক ছিলেন যিনি সঙ্ঘ যোজনায় প্রান্ত প্রচারক, প্রান্ত কার্যবাহ এবং প্রান্ত সঙ্ঘচালক— তিন দায়িত্বই অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে পালন করেছেন। বঙ্গপ্রদেশের সঙ্ঘকাজের প্রায় শুরুর সময় থেকেই সমস্তরকম বিরূপ পরিস্থিতিতে সঙ্ঘকাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রমুখ কার্যকর্তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন।

এরকম অনুভবী, তপোনিষ্ঠ ও জ্ঞানী কার্যকর্তার চলে যাওয়া মনে বেদনা ও শূন্যতা উৎপন্ন করেই; কিন্তু যে কাজের জন্য অমলদা জীবন সমর্পণ করেছিলেন তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বও আমাদের কাঁধে এসে পড়ে। স্বর্গীয় অমলকুমার বসুর জীবন থেকেই প্রেরণা নিয়ে আমাদের সেই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমরা পরমপিতা শ্রীপরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই যে, তাঁর বিদেহী আত্মা সদ্‌গতি ও শান্তিলাভ করুক এবং আমরা সবাই এই আঘাত সহ্য করে কর্তব্যপথে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি লাভ করি।

—মোহন ভাগবত

সরসঙ্ঘচালক, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

সচ্ছল ছিল না— ফলে কোনো বৌদ্ধিক প্যান্ডেল নির্মাণ করা হয়নি। শারীরিক কার্যক্রমের পর রাত্রিতে পূজনীয় গুরুজীর ভাষণ ছিল। শীতকাল কিন্তু বিকালবেলা থেকেই মেঘলা আবহাওয়া ছিল। আমবাগানের মধ্যে একটি ফাঁকা জায়গায় বৌদ্ধিক হোত। আমরা সবাই মাটিতেই বসতাম। পূজনীয় গুরুজী একটা চৌকিতে বসতেন। নীচে মাটিতে অমলদা বসতেন। বৌদ্ধিক বর্গে কোনোরূপ চাদর বা কানে মাফলার জড়ানো নিষেধ ছিল।

সমবেত গীত, একক গীত শেষ হয়ে গেল। গুরুজীর ভাষণ শুরু হলো। দু-তিন মিনিট যাওয়ার পর বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়তে শুরু করল। আমরা সবাই বুঝতে পারলাম— এবার জোর বৃষ্টি আসছে। পূজনীয় গুরুজী ভাষণ বন্ধ করে অমলদাকে জিজ্ঞেস করলেন— ''অমল, ম্যাঁয় ভাষণ বন্ধ কর দুঁ।" অমলদা গুরুজীর দিকে তাকিয়ে যেন বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, ''কিঁউ গুরুজী?" আমরা ভেবেছিলাম অমলদা হয়তো ভাষণ বন্ধ করতে বলবেন। অমলদার এই পাল্টা প্রশ্নে গুরুজী হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, ''ঠিক হ্যায়, চলনে দো।" গুরুজীর চল্লিশ মিনিট ভাষণ হলো। আকাশ থেকে সমানে বৃষ্টি পড়ছে বর্ষার বারিধারার মতো। আমরা সবাই ভিজছি। ভিজছেন গুরুজী, ভিজছেন থট্টেজী, ভিজছেন অমলদা-সহ সব কার্যকর্তা। আশেপাশের মানুষের জীবনে বিচিত্র জিজ্ঞাসা— এরা কারা? কোন গ্রহের জীব?

ভাষণ শেষ হলো। গুরুজী চলে গেলেন। ভোজন বিভাগের মদনদা (আঢ্য) অমলদার কানে কানে কি যেন বলে চলে গেলেন! আমরা যখন উঠে দাঁড়ালাম অমলদা বললেন, একটা ছোট্ট সূচনা আছে। বৃষ্টির জন্য ভোজন মণ্ডপে জল ঢুকে পড়ায় ভোজন সামগ্রী তৈরি করা যায়নি— তাই আজ রাতে কোনো ভোজনের ব্যবস্থা থাকবে না। আগামীকাল ভোর সাড়ে চারটায় যথারীতি জাগরণ।"

আমাদের জীবনে এই সূচনার কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না। কার্যকর্তা শিবির হয়েছিল তাঁবুতে। তাঁবুতে ফিরেই আমি বংশীদা ও নকুলদা ছুটে ছিলাম বাঁকার ওপারে পাউরুটি কিনতে রাতে খাবারের জন্য। কতদিন কেটে গেছে এই ঘটনার কাল প্রবাহ। আজ অমলদা নেই। এই ধরনের কঠোর অনুশাসন ও আত্মশক্তির জাগরণই অমলদা চেয়েছিলেন। অমলদা জানতেন পূজনীয় গুরুজী অসুস্থ। শীতের বৃষ্টিতে প্রবীণ স্বয়ংসেবকদের শারীরিক কষ্ট হতে পারে। তবুও ঈশ্বরীয় কার্যে জীবন গঠনের মৌলিক পরীক্ষার সামনে স্বয়ংসেবকদের দাঁড়াতেই হয়। এই পরীক্ষা উত্তরণের। পূজনীয় গুরুজীর সান্নিধ্যে এই পরীক্ষা— অনুশাসনের অগ্নি পরীক্ষা। অমলদা নিজেও ওই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই পরীক্ষা ছিল সর্বাত্মক।

সংঘর্ষময় জীবন ছিল তাঁর। অন্যায়ের সঙ্গে আপোস তিনি কখনও করেননি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্যায়ের কণিকার মধ্যে যে স্বৈরাচার লুকিয়ে থাকে তাঁকে তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। তাই তাঁর প্রতিবাদও ধ্বনিত হয়েছিল— এই সব ক্ষেত্রেও।

১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থায় সঙ্ঘ বে-আইনি ঘোষিত হয়। স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠী প্রতিবাদের কণ্ঠটুকুও স্তব্ধ করে দিয়েছিল। সঙ্ঘের বহু কার্যকর্তার সঙ্গে অমলদাকেও মিসা-তে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের মেয়াদ চিঠিতে লেখা থাকত। মেয়াদ শেষ হলে গভর্নরের সই করা আবার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আসত— তাতে লেখা থাকত— ''I am pleased to extend the term of your MISA..." ইত্যাদি। এই চিঠির ভাষা তা সকলের কাছেই যেত— সকলে এটাকেই স্বৈরাচারের ভাষা বলে মনে করতেন। কিন্তু প্রতিবাদ এল অমলদার কাছ থেকে। তিনি গভর্নরকে কড়া চিঠি দিলেন— আমি স্বাধীন দেশের নাগরিক। শিক্ষক শিক্ষণ কলেজের অধ্যক্ষ— যে শিক্ষককুল দেশ গঠনের কার্যে লিপ্ত, আমি সেই শিক্ষককুলের প্রশিক্ষণ দাতা। আমার কোনো অন্যায় নেই— তবুও বিনা বিচারে আমাকে জেলে বন্দী করে রেখেছেন আপনি। আর আমার জেলের মেয়াদ বৃদ্ধিতে আপনি 'pleased'। ''This exposes a severe brutality of your mind as well as your government which has jeopardised every norm of civility and modesty of independent country." পরবর্তীতে যখন মিসার মেয়াদ বৃদ্ধি হোত অমলদার ক্ষেত্রে পত্রে লেখা থাকত ''I am to extend the turm...।" 'Pleased' টা কালি দিয়ে কাটা থাকত।

আজ সেই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরটা নীরব হয়ে গেছে। ''In days of doubt, in days of sad brooding on my country's fate, thou art my rod and my staff– mighty true freedom of thinking, freedom of speech."

ব্যক্তিগত জীবনে আমি অমলদার স্নেহে বড় হয়েছি, আদর্শের পথে চলতে শিখেছি। কত স্থানে তাঁকে নিয়ে ঘুরেছি আজ সেসব স্মৃতি। বেশ কিছুদিন আগে কেশব ভবনে গিয়েছিলাম। চিকিৎসার জন্য ছিলাম কয়েকদিন। প্রতিটি মুহূর্ত অমলদা খোঁজ নিতেন। আমাকে পাশে বসিয়ে খাবার খেতেন। মালদহের কতসব প্রাচীন পরিবারের মানুষেরা কেমন আছেন— জানতে চাইতেন? কি বিশাল স্মরণশক্তি ছিল তাঁর! রাষ্ট্রীয় কত সমস্যার আলোচনা করতেন— নিজের দেশের উদ্যোগে ছাড়া বিদেশি শিল্পে বা ব্যবসায় দেশ বড় হয় না এটা তিনি বিশ্বাস করতেন। শিক্ষা উপকরণের অহেতুক বোঝাকে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক বলে তিনি মনে করতেন। সংগঠন বা রাজনীতিতে নিজের আত্মীয় বা দোসরদের উত্থানে দেশের যোগ্যতার পরিবেশ ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হচ্ছে— এসব কথা কত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতেন। দেশহিতবাদের মুক্তচিন্তক ছিলেন তিনি।

আজ পড়ন্ত বেলার সূর্যের মতো পশ্চিমে আমরাও এগিয়ে চলেছি। তবুও অমলদাকে পূর্ব দিগন্তের সূর্য বলে মনে হয়—

''মৃত্যুহীন মরণের যত পূজা যুগ যুগ ধরি
যে মন্ত্র এনেছে উচ্চারি
সে-মন্ত্র পেয়েছে প্রাণ তোমার পথের মাঝে
যে মন্ত্র সার্থক হলো জীবনের অবিচ্ছিন্ন কাজে।"

অমলদাকে প্রণাম।

‘আপনি কিছু জানেন না’!

বিজয় আঢ্য

অমলদা চলে গেলেন।

বাংলায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে অমলদা— অমল কুমার বসু ছিলেন অগ্রণী পুরুষ। সঙ্ঘ তাঁকে যখন যে দায়িত্ব দিয়েছে, সেই কাজেই তিনি সমর্থ, সার্থক অথচ আত্মপ্রচার বিমুখ। তাঁর অষ্টআশি বৎসরের জীবনবৃত্তে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতাটুকু বাদ দিলে তিনি ছিলেন সদা সক্রিয়— স্বয়ংসেবকদের প্রেরণার উৎস। আপাত গাম্ভীর্যের আড়ালে এক দরদি মনের মানুষ। সঙ্ঘ পরিবারের পরিধির মধ্যে ও বাইরে কেবল পদাধিকার বলে নয়, নিজ গুণেই তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন।

বাবা ছিলেন প্রবাসী বাঙালি— মধ্যপ্রদেশের ধার শহরে ওকালতি করতেন। সেখানেই অমলদার পড়াশোনা। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এমএ (ট্রিপল), এলএলবি, এম এড। আইনে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ছেলে উকিল হোক এটাই ছিল তাঁর বাবার ইচ্ছা। কিন্তু বাবার ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি— হয়েছিলেন তিনি সঙ্ঘের প্রচারক।

তিনি বালক তখন— ১৯৩৯-এ ধার-এ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শীতকালীন শিবির হয়েছিল। সেই সময়েই তিনি শাখায় এসেছিলেন। আর তার এক বছর পর— ১৯৪০ সালে নাগপুরে সঙ্ঘের প্রথমবর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে (ওটিসি) গিয়েছিলেন। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীকে (ডা: হেডগেওয়ার) দর্শনের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। এরপর যতদিন গিয়েছে ততই তিনি সঙ্ঘের কাজে সময় দিয়েছেন। ১৯৪২-এর আন্দোলন ও ১৯৪৮-এ সঙ্ঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে তিনি কারাবরণও করেছেন। আর ১৯৪৯-এ সঙ্ঘের তৎকালীন সরকার্যবাহ ভাইয়াজী দানী-র প্রেরণায় সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে বাংলায় এলেন। সে সময় বাংলার প্রান্ত প্রচারক ছিলেন মনোহর রাও হরকরে। আর পূর্ব ক্ষেত্রের প্রচারক ছিলেন একনাথ রানাডে। ১৯৫২ সালে তিনি বাংলার প্রান্ত প্রচারক হিসেবে নিযুক্ত হন। দশ বছর এই দায়িত্ব পালনের পর সঙ্ঘের আর্থিক অবস্থার কারণে প্রথমে ডায়মন্ড হারবার ও পরে নিউ ব্যারাকপুর বিএড কলেজে অধ্যাপনা শুরু করলেও সঙ্ঘের কাজ থেকে নিবৃত্ত হননি। বাংলার প্রান্ত কার্যবাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা ও সেইসঙ্গে সঙ্ঘের উপর দ্বিতীয়বার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো। সেই সময় সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনার জন্য তিনি আবার প্রচারক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আত্মগোপন করে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে জনজাগরণের কাজ করতে থাকেন। কিন্তু যে-কোনো ভাবেই হোক পুলিশ খোঁজ পেয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলবন্দি করে। জরুরি অবস্থা ও সঙ্ঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর আবার তিনি বাংলার প্রান্ত প্রচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর— ১৯৭৯ সালে বাংলার তৎকালীন প্রান্ত সঙ্ঘচালক শ্রী কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী (মাস্টারমশায়)-র মৃত্যু হলে তিনি প্রান্ত সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নিজের এই দায়িত্ব নিয়ে তিনি মজা করে বলতেন— ‘আমি হচ্ছি শালগ্রাম শিলা। সঙ্ঘ যে ভাবে রাখে, সেভাবেই থাকি।’ শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অযোধ্যায় রামজন্মভূমিতে ধাঁচা ধ্বংস হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালে তৃতীয়বার সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার পর তিনি কারাবরণ করেন। কয়েক বছর তিনি বিদ্যাভারতীর পূর্বক্ষেত্রের সভাপতি ছিলেন। স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট গঠনের সময় থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি শুধু ট্রাস্টের সদস্যই ছিলেন না, স্বস্তিকা-র সার্বিক বিকাশে পথপ্রদর্শকও ছিলেন।

জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি এবং তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু বাংলার প্রাক্তন প্রান্ত প্রচারক বসন্তরাও ভট্ট কেশব ভবনে একই ঘরে থাকতেন। খুব কাছ থেকেই দীর্ঘদিন ধরে এই দুজনকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। অমলদা বেশ রাশভারী মানুষ ছিলেন। ২৬ বিধান সরণির যে কোণের ঘরটাতে তিনি থাকতেন সেখানে ঢুকতে একটু দ্বিধাই হোত। পরে অবশ্য তা আর ছিল না। অমলদার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল— খুব স্পষ্টবাদী ছিলেন। সোজাসুজি বলতেন। এতে হয়তো যাকে বলছেন, তিনি আহত হতে পারেন। আসলে অমলদা সত্যকে আঁকড়ে থাকতেন, তাই বোধ হয় কোনো সঙ্কোচ করতেন না। বলতেন— গুরু গৈরিক ধ্বজ ছাড়া আর কোথাও মাথা নোওয়াবে না। এমনই আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ ছিলেন অমলদা। আর এই বোধ

থেকেই বোধহয় তিনি 'টোয়েন্টি নাইন' তাস খেলার উদাহরণটা আমাদের সামনে রাখতেন। ওই খেলায় ১৬, ১৭, ১৮ ইত্যাদি ক্রমে ডাক হয়। আর সেই ডাক চ্যালেঞ্জ করার মতো যাদের হাতে তাস আছে, তারা সেই ডাকের প্রত্যুত্তরে বলতো— আছি। অমলদার আগ্রহ ছিল আমাদেরও বলতে হবে— আছি। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই নিজের আদর্শগত অবস্থান থেকে নড়া চলবে না। বস্তুত তাঁর দীর্ঘজীবনে সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় সবসময় তিনি সঙ্ঘকাজে সক্রিয়ভাবেই পাশে ছিলেন।

মানুষকে নিয়েই সংগঠনের কাজ। তাই ত্রুটি-বিচ্যুতি হতেই পারে। কিন্তু কীভাবে তার মোড় বা গতি অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে হয় এ প্রসঙ্গে তিনি যে উদাহরণটা তুলে ধরতেন তা বেশ চিত্তাকর্ষক। এক ঘোড়সওয়ার দেখল তার আস্তাবল থেকে কয়েকটা ঘোড়া বেরিয়ে গিয়ে পাহাড়ের দিকে ছুটছে। সে বুঝলো কী সর্বনাশ হতে চলেছে। কেননা একটু দূরেই গভীর খাদ। সে আর একটুও দেরি না করে অনেক দ্রুত গতিতে নিজের ঘোড়াটিকে নিয়ে ওই ঘোড়াগুলিকে ডিঙিয়ে সামনে চলে গেল। আর খাদের কিনারার পৌঁছনোর আগেই নিজের ঘোড়াটার মোড় ফিরিয়ে দিল। পেছনের ঘোড়াগুলিও তার ঘোড়াটাকে অনুসরণ করল। ঘোড়াগুলি বেঁচে গেল। গল্পের ভঙ্গিতে বলা উদাহরণটা যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমন তাৎপর্যপূর্ণও। সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের এই মোড় ফিরিয়ে দেওয়ার মতো বিচক্ষণতা চাই। সংগঠনের প্রধান হিসেবে তিনি সহকর্মীদের 'ট্যারাইন সার্ভে'-র কথাও বলতেন। নিজেদের কার্যক্ষেত্রের অবস্থান যেন নিজের হাতের তালুর মতো পরিচিত হয়— এটাই ছিল তাঁর ভাবনা।

এরকম অনেক ছোট ছোট ঘটনার কথা মনে পড়ছে। যেমন, একজন স্বয়ংসেবক নিজের হাতঘড়িটা বাইরে রেখে বাথরুমে গিয়েছে। তাকে বলছেন, শুধু নিজে সৎ থাকলে হবে না, অপরকেও সৎ হতে সাহায্য করতে হবে। একবার চুঁচুড়া শহরের কেন্দ্রস্থলে সঙ্ঘের নিবাসের জন্য ১৪০ টাকায় ঘরভাড়া নেওয়া হলে তিনি বললেন, প্রচারকদের 'আরাম' করে থাকতে শেখাচ্ছ। বস্তুত তাঁর জীবন এতটাই সাদাসিধে ছিল যে ২৬ নং-এর টেবিলে বসে তাঁকে কাগজ কেটে খাম তৈরি করতেও দেখেছি। অথচ এই অমলদা-ই কারও কোনো খুশির খবর হলে তার জন্য মিষ্টি আনাতে কিংবা কাজের লোকের পূজার পার্বনী দেওয়ার ক্ষেত্রে উদার হস্ত। বস্তুত যাঁরা অমলদাকে কাছ থেকে দেখেছেন তাঁরা এমন অনেক ঘটনার কথাই বলতে পারবেন।

এক সাংবাদিকের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে তৎকালীন বাংলার সঙ্ঘের কাজের অবস্থান সম্পর্কে অমলদার মূল্যায়ন— ''সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সমাবেশের জন্য বিগ্রেডটা আমাদের কাছে বড়, কিন্তু শহীদ মিনারটা ছোট হয়ে পড়বে।'' নিজের কার্যক্ষেত্র সম্পর্কে কতটা গভীর অধ্যয়ন থাকলে এমন স্পষ্ট অথচ সহজ উত্তর দেওয়া যায়। অথচ এই অমলদাকেই সঙ্ঘ সম্পর্কে কিছু তিনি জানেন না— এই অভিযোগ শুনতে হয়েছে। অমলদা বেশ হাসতে হাসতেই এই ঘটনা আমাদের বলতেন। আমরা বেশ মজা পেতাম। আর এস এস সিআইএ-র কাছ থেকে টাকা পায়— তাঁর এক অধ্যাপকবন্ধুর এমন অভিযোগের কথা যখন তিনি অস্বীকার করেছেন, তখন বন্ধুর জবাব ছিল— ''এসব অনেক উঁচু তলার ব্যাপার। আপনি কিছু জানেন না''! আসলে ধ্যেয়নিষ্ঠ স্বয়ংসেবকের মতো অমলদা কখনও বিচলিত হতেন না। আপন ব্রতে আত্মমগ্ন পুরুষ। 'Intense work with intense rest'— প্রচণ্ড কর্মপ্রবাহের মধ্যে গভীর আত্মতন্ময়তা। ■

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
29 September - 2014

SURYA

EVERY CITY EVERY HOME

The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions, unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from EVERY CITY EVERY HOME

SURYA ROSHNI LIMITED

Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

দাম : ১০.০০ টাকা